উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে—ان الشرك لظلم عظيم "নিশ্চয় জানিও "শেরক" সবচেয়ে বড় অন্যায়—বড় অত্যাচার।" (২১ পাঃ ১১ রুঃ)।

ব্যাখ্যা ঃ—"যুল্‌ম" শব্দের অর্থ অন্যায়-অত্যাচার। গোনাহ মাত্রই আল্লার নাফরমানী হওয়ার কারণে অন্যায় এবং নিজের প্রতি অত্যাচার। ছাহাবীগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াই ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে—কোনও গোনাহ করে নাই এমন নিষ্পাপ আমাদের মধ্যে কে আছে? অতএব দেখা যায় আমাদের মধ্যে কেহই, পরিত্রাণ পাইবার যোগ্য নহে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উক্ত আয়াতের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন যে—এই আয়াতে সাধারণ গোনাহের অর্থে যুল্‌ম শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, বরং এখানে "শেরক"কে যুল্‌ম বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ শেরক করা হইলে কেহই পরিত্রাণ পাইবে না ইহা ধ্রুব। অনেকে অজ্ঞতা বশতঃ "শেরক"কে যুল্‌ম বা অত্যাচার মনে করে না, কিন্তু ইহা তাহাদের নিতান্ত মূর্খতা। বিশ্ব-প্রখ্যাত জ্ঞানী "লোকমান" স্বীয় পুত্রকে নছিহত ও উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, যাহা কোরআন শরীফেও উল্লেখ আছে—

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

"হে বৎস! আল্লার সঙ্গে শরীক করিও না; নিশ্চয় জানিও—শেরক অতি বড় যুল্‌ম।" আলোচ্য হাদীছে নবী (দঃ) উক্ত আয়াত দৃষ্টের যুল্‌মের ব্যাখ্যা শেরকের দ্বারা করিয়াছেন।

মোনাফেকের নিদর্শন

২৯। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

অর্থ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—মোনাফেকের তিনটি চিহ্ন……(১) কথায় কথায় মিথ্যা বলিবে, (২) ওয়াদা ও অঙ্গীকার করিয়া ভঙ্গ করিবে, (৩) আমানতে খেয়ানত করিবে।

৩০। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمرو قال النبى صلى الله عليه وسلم

اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

অর্থ :—আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এমন চারিটি চরিত্রদোষ আছে যে, কোন ব্যক্তির মধ্যে উহার সমষ্টি পাওয়া গেলে সে পুরাপুরি মোনাফেক পরিগণিত হইবে এবং উহার কোনও একটি পাওয়া গেলে তাহার মধ্যে মোনাফেকের খাছলত ও স্বভাব আছে বলা হইবে। (১) আমানতে খেয়াতন করা (২) কথায় কথায় মিথ্যা বলা (৩) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা (৪) কাহারও সঙ্গে মতানৈক্য বা বিরোধ হইলে তাহাকে গালাগালি করা।

ব্যাখ্যা :—মোনাফেক দুই প্রকার। (১) মতবাদীক মোনাফেক ; অর্থাৎ অন্তরে মোটেই নাই, শুধু মৌখিক দাবীতে বা বাহ্যিক আগলে মোসলমানরূপী। এই শ্রেণী কাফের এবং প্রকাশ্য কাফের অপেক্ষা কঠিন আজাব ভোগ করিবে। (২) আমলী মোনাফেক ; অর্থাৎ অন্তরে সঠিক ঈমান বিদ্যমান আছে, কিন্তু ইসলামের বরখেলাফ কাজ করিয়া থাকে এই শ্রেণী কাফের নয়, বরং ফাছেক ; আজাব ভোগ করিতে হইলেও অবশেষে চিরবেহেশতী হইবে। উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর মোনাফেকী উদ্দেশ্য।

লাইলাতুল-ক্বদরে এবাদত করা ঈমানের শাখা

৩১। হাদীছ :— عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ يَّقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ -

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং আখেরাতে আল্লার নিকট ছওয়াব পাইবার আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া লাইলাতুলকদরে এবাদত করিবে, ঐ ব্যক্তির পূর্ববর্তী (ছগীরা) গোনাহসমূহ মাফ হইয়া যাইবে।

জেহাদ করা ঈমানের শাখা

৩২। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি কেবলমাত্র এই আকর্ষণের বশবর্তী হইয়া আল্লার রাস্তায় জেহাদ করিতে বাহির হইবে যে, একমাত্র আল্লার উপর ঈমান ও তাঁহার রসুলের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও অকুণ্ঠ সমর্থনই তাহাকে জেহাদের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে (অন্য কোনও মোহে নহে)। আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য নির্দ্ধারিত রাখিয়াছেন—হয় তাহাকে ছওয়াব ও গণীমতের* মাল-দৌলত দ্বারা সাফল্যমণ্ডিত করিয়া স্বগৃহে ফিরাইবেন,

* কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে (ধর্মযুদ্ধে) জয়ী হইয়া শত্রু পক্ষ হইতে যে সকল মালামাল, অর্থ-সম্পদ, অস্ত্র-শস্ত্র বা সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি হস্তগত হইয়া থাকে, উহাকেই 'গণীমত' বলা হয়। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পূর্ববর্তী অন্য কোনও নবীর শরীয়তে এই সকল মাল

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

নতুবা সোজাসুজি বেহেশতে পৌঁছাইবেন। (রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন—) যদি সকলের কষ্ট হইবে ইহা লক্ষ্য না করিতাম, তবে আমি প্রতিটি জেহাদকারী দলেই যোগদান করিতাম+। (জেহাদের প্রতি) আমার প্রাণের আকাঙ্খা এই—আল্লার রাস্তায় শহীদ হই, আবার জীবিত হইয়া পুনরায় শহীদ হই এবং পুনরায় জীবিত হইয়া আবার শহীদ হই।

তারাবীর নামায (ফরয নয়, কিন্তু) ঈমানের শাখা

৩৩। হাদীছঃ— عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ -

অর্থঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং আখেরাতে আল্লার নিকট ছওয়াব পাইবে এই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া রমজানের নামায (তারাবীহ) আদায় করিবে তাহার পূর্ববর্তী (ছগীরা) গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

রমযানের রোযা রাখা ঈমানের শাখা

৩৪। হাদীছঃ— عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ -

অর্থঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং ছওয়াবের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া রমযানের রোযা রাখিবে তাহার পূর্ববর্তী (ছগীরা) গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যাঃ—লাইলাতুল কদর, রমযানের রোযা ও তারাবীহ ইত্যাদির বিশেষত্ব ও মর্তবা দৃশ্যও নহে বা ব্যবহারিক যুক্তি-প্রমাণে সাব্যস্ত হওয়ার বস্তুও নহে। এ সবের বিশেষত্ব মর্তবা একমাত্র আল্লাহ ও রসুলের ঘোষণার প্রতি অকুণ্ঠ ও অকাট্য বিশ্বাস ও একীন

ভোগ করার অনুমতি ছিল না; বরং উহা একত্রিত করা হইত এবং ঐ যুদ্ধ আল্লার দরবারে কবুল হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ আকাশ হইতে অগ্নিশিখা আসিয়া ঐগুলি ভস্ম করিয়া দিত।

কিন্তু আমাদের শরীয়তে ঐ সকল মালামাল এই বিধান মতে উপভোগ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে যে, ঐ সকল বিজিত ও প্রাপ্ত সম্পূর্ণ মাল ঐ যুদ্ধে নিয়োজিত আমীর অথবা রাষ্ট্রের খলীফার নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। তিনি ঐ মালের এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগার বাইতুল মালে রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত মাল মুজাহিদগণের মধ্যে বন্টন করিবেন।

+ রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং কোনও জেহাদে যোগদান করিলে সেই জেহাদে বিশেষভাবে সকলেই যোগদানের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িত। অথচ সকলের জন্য সব সময় শক্তি সামর্থ্য সঞ্চয় করা সম্ভব হইত না বিধায় তাহারা মর্মাহত হইত। তাহাদের এই মনোবেদনার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রয়োজন না হইলে স্বয়ং সর্বদা জেহাদে শামিল হইতেন না।

স্থাপন করার উপরই নির্ভর করে। আল্লার ঘোষণা :— ليلة القدر خير من الف شهر "লাইলাতুল-কদরের এক রাত্রির এবাদৎ হাজার মাসের এবাদৎ অপেক্ষা উত্তম।" যে ব্যক্তি এই ঘোষণা ও ৩১ নম্বর হাদীছের প্রতি খাঁটী ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, সেই বিশ্বাসই তাহাকে লাইলাতুল-কদরের এবাদতের প্রতি আকৃষ্ট ও সক্রিয় করিয়া তুলিবে। এই বিশ্বাস অন্তরে থাকাবস্থায় কেহই ঐ রাত্রিকে নিদ্রায় কাটিতে দিতে পারে না। তদ্রূপই যে ব্যক্তি আল্লার ঘোষণা—كتب عليكم الصيام "তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হইয়াছে" এবং ৩৪ নম্বর হাদীছে পূর্ণ বিশ্বাসী হইবে, সে কখনও রোযা ভঙ্গ করিবে না। ঐ সকল ঘোষণার প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসই তাহাকে রোযা রাখায় আকৃষ্ট করিবে। এইরূপে যে ব্যক্তি ৩৩ নম্বর হাদীছে বিশ্বাসী ; ঐ বিশ্বাসই তাহাকে তারাবীর নামাযের প্রতি অনুপ্রাণিত করিবে।

উপরোল্লিখিত তিনটি হাদীছের মধ্যে যে—ايمانا وحتسابا "ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ, ছওয়াবের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া" বলা হইয়াছে, উহার তাৎপর্য্য ইহাই যে—যে ব্যক্তি অন্য কোন প্রকারের মোহ বা ভাবাবেগে পরিচালিত হইয়া নহে, বরং কেবলমাত্র আল্লাহ ও রসুলের উপরোক্ত ঘোষণাসমূহের প্রতি অগাধ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং নিছক ছওয়াবের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া এই সব এবাদৎ করিবে কেবলমাত্র তাহারই জন্য পূর্ববর্ণিত সুসংবাদ।

প্রকাশ থাকে যে, আখেরাতের যাবতীয় আমলই তদ্রূপ। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলের আদেশ বা ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আমল করিবে কেবলমাত্র সে-ই উহার পুরস্কার পাইবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার কোন মোহে বা অন্য কোনও সাময়িক কারণে যত বড় নেক আমলই করা হউক না কেন, আখেরাতে উহার কোন ছওয়াব পাওয়া যাইবে না।

ইসলাম ধর্ম অতি সহজ

হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট বিশেষ পছন্দনীয় দ্বীন ও ধর্ম এই দ্বীনে-মোহাম্মদী, যাহা মধ্যে কোন প্রকার বক্রতা নাই এবং যাহা অতিশয় পবিত্র ও অতি সহজ।

৩৫। হাদীছ :— عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَأَبْشِرُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—দ্বীন (অর্থাৎ দ্বীনের বিধি-বিধান ও উহার পন্থাসমূহ) অত্যন্ত সহজ ও সরল। কিন্তু যে কোনও ব্যক্তি দ্বীনের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করিবে সে পরাজিত হইবে। তাই সকলের

কর্তব্য হইবে, ঠিকভাবে দৃঢ়তার সহিত ইসলামের নির্দেশিত পথ অবলম্বন পূর্বক অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি বা বাড়াবাড়ি না করিয়া ধীরস্থির গতিতে মধ্য পন্থা অবলম্বন করিয়া চলা এবং আল্লার রহমত ও করুণার আশা পোষণ করা এবং সকাল-বিকাল ও শেষ রাত্রে নফল এবাদৎ দ্বারা (অধিক নৈকট্য লাভ ও উন্নতির পথে) সাহায্য গ্রহণ করা।

ব্যাখ্যা ঃ—ইসলামের ধর্মীয় বিধানসমূহ সমষ্টিগত ভাবে অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ের সমস্ত ধারা ও উপধারা সমূহের সম্মিলিত ফরমুলা দৃষ্টে এই দাবী অনস্বীকার্য্য যে, ইসলাম ধর্মের বিধানাবলী ও পন্থাসমূহ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য। ইহার কোনও ধারা বা বিধান এরূপ কোনও নিয়ম বা ফরমুলায় গঠিত নয় যদ্দরুণ কেহ কোন সময় কোন অবস্থায় অচল হইয়া পড়িতে পারে বা কোন বিধান মানুষের সাধ্যের উর্দ্ধে যাইতে পারে। যেমন "নামায"—ইহার সাধারণ পন্থা ও বিধান হইল দাঁড়াইয়া পড়া, কিন্তু কেহ দুর্বল হইলে সে বসিয়া পড়িবে, আরও দুর্বল হইলে কাযা করিবে। এই কাযা আদায় করার সুযোগ না পাইয়া মরিয়া গেলে মাল দ্বারা ফিদ্‌য়্যা আদায় করিবে। সেই ফিদ্‌য়্যা আদায় করার মধ্যেও এরূপ সুযোগ-সুবিধার সূত্র আছে যে, উহা ধনী-গরীব কাহারও অসাধ্য হইবে না। নামাযের জন্য "অজু" করা অপরিহার্য্য, কিন্তু পানি ব্যবহারে অসমর্থ হইলে মাটি, বালু বা পাথরের উপর তায়াম্মুম করিবে। সাধারণতঃ এই তিনটি বস্তু কোথাও দুর্লভ হয় না। তাহাও যদি অপ্রাপ্তব্য হয়, তখন মছআলাহ এই যে—নামাযের সময় অনুসারে বিনা অজুতেই নামাযের কার্য্য সমূহ সম্পাদন করিবে, পরে পানি বা তায়াম্মুমের বস্তু পাওয়া গেলে তখনকার অবস্থানুসারে ব্যবস্থাবলম্বন পূর্বক ঐ নামায কাযা পড়িবে। নামাযের জন্য ছুরা-কেরাত পাঠ করা অপরিহার্য্য, কিন্তু উহা জানা না থাকিলে আপাততঃ শিক্ষা করা সাপেক্ষে শুধু "ছোবহানাল, আলহামদুলিল্লাহ" পড়িয়া নামায আদায় করিবে। এইভাবে প্রতিটি এবাদতের বিধি-ব্যবস্থার মধ্যেই সামর্থানুযায়ী ও সহজ সাধ্য হইবার জন্য সুযোগ সুবিধার কোনই অনটন নাই, আছে শুধু আমাদের আন্তরিকতাপূর্ণ আগ্রহের অভাব।

এবাদৎ ছাড়া "মোয়া'মালাত" অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি পার্থিব ও অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত ব্যবস্থা ও বিধি-নিষেধগুলিও তদ্রূপ। শরীয়তের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ম কানুন, ধারা-উপধারা সম্মিলিত ফরমুলা কোন ক্ষেত্রেই অসহজ বা উন্নতি ও প্রগতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী নহে।

অনেকে হয়ত এক্ষেত্রে ইসলামের অকাট্য বিধান "সুদ হারাম" বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিবেন যে, ইহা ত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অন্তরায়। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা একটি সুফলদায়ক, বরং বর্তমান যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য একটি অপরিহার্য্য মাধ্যম। তদ্রূপ "ইন্সিওরেন্স বা বীমা" ব্যবস্থা; উহাও ইসলাম ও শরীয়তের বিধানে নিষিদ্ধ ও হারাম; অথচ এই ব্যবস্থাও বিপদগ্রস্ত, অনাথ এতিম-বিধবার জন্য এবং আকস্মিক ক্ষতি-গ্রস্তদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক।

এই শ্রেণীর সমালোচনা বস্তুতঃ ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা প্রসূত। ব্যাঙ্কিং একটি আধুনিক ব্যবস্থা বটে, কিন্তু উহার জন্য সূদপন্থা ছাড়া শরীয়তে বিকল্প ব্যবস্থা রহিয়াছে। তদ্রূপ বীমা ব্যবস্থার প্রয়োজন মিটাইবার এবং উহার সুফল লাভেরও শরীয়ত সম্মত বিকল্প ব্যবস্থা রহিয়াছে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় সূদপন্থার বিকল্প পন্থাটি সূদপন্থা অপেক্ষা এবং বীমা ব্যবস্থার বিকল্প পন্থাটি প্রচলিত হারাম পন্থা অপেক্ষা জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধনে অধিক সুফলদায়কও বটে। সংক্ষেপে একটি বিষয় অনুধাবন করুন।

দীর্ঘ দিনের ইতিহাসে দেখা যায়, পুঁজিপতিত্ব তথা গরীবদেরকে দারিদ্রের যাতাকলে দাবাইয়া রাখিয়া তাহাদের শ্রম এবং মধ্যবিত্তদেরকে বিভিন্ন মারপেঁচের চাপাকলে পেঁচাইয়া দিয়া তাহাদের ধন শোষণ করতঃ কতিপয় লোক ধনে সম্পদে বিরাটকায় হওয়ার নীতি ভূপৃষ্ঠে আস্তানা জমাইয়া ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, জনগণের সংখ্যা গরিষ্ঠ গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী পুঁজিপতিদের পোষণে অতিষ্ট হইয়া উঠে এবং ব্যক্তিগত মালিকানাকে পুঁজিপতিত্বের মূল মনে করিয়া উহাকে নির্বিচারে খতম করিতে তাহারা মারমুখী হইয়া উঠে; ফলে যুগে যুগে দেশে দেশে ধ্বংস ও বিপর্যয় নামিয়া আসে।

ইসলাম-পূর্ব যুগেও পুঁজিপতিত্বের অভিশাপ ও যাতাকল চালিত ছিল, তাই ইসলাম মানবীয় কল্যাণের স্বাভাবিক কারণে ব্যক্তি-মালিকানা সমর্থন করিয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধি-বিধান এমনভাবে সুবিন্যস্ত করিয়াছে যাহাতে কোন পথেই পুঁজিপতিত্বের তথা ব্যক্তি বা গোষ্ঠি ও গ্রুপবিশেষ অন্যদের মাথায় কাঠাল ভাঙ্গিয়া শুধু নিজেদের ভুরি ভরার সুযোগ না পায়। অর্থ বন্টন বা লাভের ভাগী করার ক্ষেত্রে যত দূর সম্ভব বেশী সংখ্যায় জনগণকে সুযোগ দান করাই ইসলামের নীতি। পুঁজিপতিদের চেষ্টা হইল কায়দা-কানুন করিয়া অন্যদের টাকার লাভ সম্পূর্ণ বা উহার সিংহ ভাগ গুটি কয়েক মানুষের ভোগ করা। ইসলামের বিধি-বিধান ইহার সম্পূর্ণ অন্তরায়। পবিত্র কোরআন পরিস্কার বলিয়াছে—كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ "ধন-সম্পদ যেন শুধু ধনীদের মধ্যেই কুক্ষিগত না থাকে।" বড় শোষক তথা ক্ষমতাধিকারী শাষকদের বেতন ভাতা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের বিধানে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ইসলাম উক্ত নীতিরই বিকাশ সাধন করিয়াছে; বিস্তারিত বিবরণ সুদীর্ঘ; এখানে সেই নীতির দৃষ্টিতেই আলোচ্য বিষয়দ্বয়ের উপর আলোকপাত করা হইতেছে।

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা:— প্রচলিত পন্থায় এই ব্যবস্থাটি পুঁজিপতিত্বের একটি ফন্দি ও ফাঁদ। কতিপয় ধনী তাহাদের কিছু ধন একত্রিত করিয়া বা সিন্দুক এবং টেবিল-চেয়ার লইয়া বসে। মধ্যবিত্ত লোকদের কোটি কোটি টাকা একত্রিত হইলে নিজেদের টাকার শত গুণ বেশী টাকা লোন নিয়া ব্যক্তিগত বড় বড় ব্যবসা চালায়। তদুপরি ব্যাঙ্কেরও বড় বড় ব্যবসায় যে বিরাট লাভ হয় উহার মাত্র সামান্য অংশ সেভিংস এবং ফিক্স-ডিপোজিটার

দেরকে দিয়া লাভের সর ও সিংহ ভাগ কতিপয় বিত্তবান ডাইরেক্টারই নিয়া যায় এবং তাহারা এক একজন লক্ষপতি ও কোটিপতি হয়, আর মূল টাকার মালিক যাহারা, তাহারা নিজেদের অবস্থার উপরই থাকে। ইহা সম্ভব হয় একমাত্র সূদীবস্থার মাধ্যমে।

শরীয়তের বিকল্প ব্যবস্থা হইল এই যে, ব্যাঙ্কের সমুদয় লোন বা লগ্নি মিল-কারখানায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সূদ ভিত্তিক না করিয়া সকলের ক্ষেত্রেই এমনকি ডাইরেক্টারদের লোনের ক্ষেত্রেও অংশীদার ভিত্তিক করিতে হইবে। তদ্রূপ ব্যাঙ্কের সকল সূত্রের আয়ের বন্টন কাহারও জন্য সূদ ভিত্তিক না করিয়া অংশীদার ভিত্তিক করিতে হইবে। ডাইরেক্টারগণ, সেভিংস ও ফিক্স-ডিপোজিটারগণ সকলে এক নির্দ্ধারিত ফরমুলার অধীনে যথাসম্ভব বেশী সংখ্যায় কারেন্ট-একাউন্টারগণও কোম্পানী এবং লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের ন্যায় অংশীদার গণ্য হইবে। কিন্তু প্রচলিত সাধারণ লিমিটেডের ন্যায় নয়—যে, ডাইরেক্টারগণ বেতন-ভাতা, গাড়ী-বাড়ী ও জাকজমকের মাধ্যমে এবং কল-কৌশলে সব সর খাইবে; আর শেয়ার হোল্ডারদের জন্য ডাইরেক্টারদের ইচ্ছাধীন রিবিট ঘোষণা করিবে। বরং প্রাইভেট লিমিটেডের ন্যায় সকল অংশীদার সম সুযোগে লাভবান হইবে। ইহাকে শরীয়তের পরিভাষায় "মোজারাবা" বলা হয়।

এই পন্থায় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা জায়েয ও শুদ্ধও হয় এবং উহার লাভে অধিক সংখ্যক জনগণ লাভবান হওয়ার সুযোগ পায়। একে ত ডাইরেক্টার বা বড় বড় ব্যবসায়ী ও মিল মালিকগণ সামান্য সূদে ব্যাঙ্কের টাকা লগ্নি নিয়া নিজেরা অধিক লাভের অধিকারী হইতে পারে না; ব্যাঙ্কের টাকার অংশকে নিজের টাকার অংশের ন্যায় লাভের অংশীদার বানাইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ—ব্যাঙ্কের টাকার সুযোগ-সুবিধা ও লাভের সিংহ ভাগ শুধু ২০।৫০ জন ডাইরেক্টারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না যে, তাহারা উহা দ্বারা ফুলিয়া ফাপিয়া উঠিবে, বরং উহা লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি জনসাধারণের মধ্যে সম অনুপাতে বন্টিত হইয়া থাকে।

বীমা ব্যবস্থা :—এই ব্যবস্থাটিও প্রচলিত পন্থায় পুঁজিপতিত্বের আর একটি কৌশল। জনগণের টাকা কুড়াইয়া উহার ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভ গুটী কয়েক ডাইরেক্টার ভোগ করিয়া থাকে। জনগণের টাকার লাভ গুটি কয়েক মানুষের ভোগ বিলাস যোগাইবে ইহা অনুমোদন কেন করা হইবে? জনগণের টাকার লাভ সংগ্রহ করার সুযোগের অধিকারী হইল জন-সাধারণের প্রতিষ্ঠান বাইতুল মাল—যাহার তত্বাবধায়ক হইবে সরকার। সরকার সেই ব্যবসা ইত্যাদির শুধু পরিচালক হইয়া উহার লাভ বাইতুল মালের মাধ্যমে সর্ব-সাধারণের কল্যাণে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করিলেন। সেই ব্যবস্থায় বাইতুল-মালের বীমা শাখা কিস্তি ও প্রিমিয়াম দাতাদের সাহায্য ও করিবেই, এতদ্ভিন্ন বীমা ব্যবস্থার উদ্বৃত্ত লাভ যাহার দ্বারা বর্তমান পন্থায় গুটি কয়েক ডাইরেক্টার বিলাস বহুল গাড়ী-বাড়ী ভোগের সহিত লাখ লাখ কোটী কোটী টাকার পুঁজি করিতেছে; বাইতুল-মাল সেই লাভের টাকা ঐসব অনাথ

নিরাশ্রয় এতিম-বিধবাদের সাহায্য খাতে ব্যয় করিবে যাহাদের অভিভাবক জীবিত থাকা-কালেও বীমার প্রিমিয়াম দানে অসমর্থ ছিল। এই হিসাবে বীমা ব্যবস্থার বর্তমান পন্থা অপেক্ষা ইসলাম অনুমোদিত পন্থা জন-কল্যাণে কত অধিক উন্নত তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই ভাবিতে পারে। বর্তমান পন্থায় অনার্থ এতিম-বিধবাদের কল্যাণ অপেক্ষা পুঁজিপতি ডাইরেক্টারদের কল্যাণই অধিক। পক্ষান্তরে ইসলাম অনুমোদিত পন্থায় কল্যাণের সবটুকু জনগণের মধ্যে বিতরিত, এমনকি প্রিমিয়ামদানে অসমর্থ গরীব-দুঃখী নিরাশ্রয় এতিম বিধবাও সেই কল্যাণের ভাগী হইয়া থাকে।

অনাথ নিরাশ্রয় এতিম-বিধরাদের কল্যাণ ও সহায়তায় ইসলামী বিধান এত অধিক অগ্রসর যে, উহাকে কোন কোম্পানীর উপর নির্ভরকারী রাখে নাই বা প্রিমিয়ামের টাকা জমা থাকার উপর সীমাবদ্ধ রাখে নাই। ইসলাম বিধানগত ভাবে এতিম বিধবার রক্ষণ-বেক্ষণ বাইতুল-মালের মাধ্যমে সরকারের দায়িত্ব সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বাইতুল-মাল প্রতিষ্ঠা করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهٖ وَمَنْ تَرَكَ ضِيَاعًا فَهُوَ اِلَيَّ

"কোনও ব্যক্তি ধন-সম্পত্তি রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে উহা তাহার উত্তরা-ধিকারীগণের জন্য ; আমি (অর্থাৎ রাষ্ট্রের খলীফা) উহাকে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিব না। আর যদি কোনও ব্যক্তি অসহায়-নিরুপায় এতিম-বিধবা পরিবারবর্গ রাখিয়া মারা যায়, তবে আমি (অর্থাৎ রাষ্ট্রের খলীফা) তাহার ঐ অসহায় পরিবারবর্গের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিব"। ইহা কি ইসলামের অতুলনীয় সমাজ ব্যবস্থা নহে ? বিধানগত বহুমুখী আয়ের ভাণ্ডার বাইতুল-মালের মাধ্যমে এই ঘোষণার বাস্তবায়ন শুধু সম্ভবই নহে সহজও বটে। অন্য কোন সমাজ ব্যবস্থায় এই প্রকার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার নজীর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি ? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরেও মোসলেম কর্ণধারগণ বহুকাল পর্য্যন্ত ইসলামের এই সকল মহতী পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিয়া চলিয়া-ছিলেন, ইহা শুধু কাগজ-কলমের পরিকল্পনাই ছিল না।

মোসলেম সমাজ ইসলামী শিক্ষা হইতে দূরে সরিয়া অনৈসলামিক শিক্ষা ও ভাবধারায় নিমজ্জিত হইবার পর তাহাদের আত্মগৌরব ও আত্মনির্ভরশীলতা লোপ পাইয়া গিয়াছে এবং নিজেদের সহজ ও হালাল পরিকল্পনা সমূহ কার্যাক্ষেত্র হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে বিজাতীয় শোষণ-নীতির অনুকরণে অসাধু উপায়ের হারাম পরিকল্পনা সমূহ প্রচলিত হইয়াছে। ইহা আমাদের কর্মের ফল। রসুলুল্লাহ (দঃ) সতর্কবাণী করিয়াছেন—যে ক্ষেত্রেই কোন সুন্নত (অর্থাৎ ইসলামী রীতি) উঠিয়া যাইবে সে ক্ষেত্রে ঐ সুন্নতের পরিবর্তে অন্য একটি বেদয়াৎ (অর্থাৎ অনৈসলামী রীতি) উহার স্থলাভিষিক্ত হইবেই।

ইসলামের সামগ্রিক প্ল্যান-পরিকল্পনার সুদীর্ঘ ফরমুলা হইতে কোনও একটি মাত্র ধারাকে বাছিয়া লইয়া উহা কঠিন হওয়া সম্পর্কে সমালোচনা করা নিতান্তই মূর্খতা। কেননা, যেমন কোন বিশিষ্ট ফরমুলায় তৈরী মিকশ্চার বা টনিকের পূর্ণ ফরমুলা পরিত্যাগ করতঃ কেবলমাত্র উহার দুই একটি উপাদান লইয়া ব্যবহার করিলে সেই মিকশ্চার বা টনিকের ফল পাওয়া ও দূরের কথা, উহা অসার ও বিস্বাদ বোধ হওয়া এবং উপকারের পরিবর্তে অপকার হওয়াই স্বাভাবিক। তেমনি ভাবে ইসলামের অর্থ নৈতিক উন্নতি ও কল্যাণে বিধায়ক পরিকল্পনার ফরমুলা হইতে শীর্ষস্থানীয় ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করিয়া "সুদ, জুয়া হারাম" এই বিধানটি তিক্ত ও কঠিন বোধ হইলে তজ্জন্য ইসলাম দায়ী হইবে না এবং ৩৫ নম্বরে বর্ণিত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ সমালোচনার সম্মুখীন হইবে না। সে জন্য দায়ী ও দোষী হইবে উহারাই যাহারা ইসলামের ঐ সকল মহতী পরিকল্পনা ও ফরমুলাকে নিজেদের ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও ইসলামী শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকার ফলে অকেজো ও পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে।

নামায ঈমানের একটি বিশেষ অঙ্গ

৩৬। **হাদীছঃ**— ছাহাবী বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় পৌঁছিয়া ("কোবা" ত্যাগ করতঃ) প্রথম হইতে স্বীয় (বংশের) মাতুল সম্পর্কীয় আত্মীয়গণের মধ্যে অবস্থান করিলেন। তখন প্রথমাবস্থায় তিনি ১৬ বা ১৭ মাস পর্যন্ত বাইতুল-মোকাদ্দসের দিকে (কা'বা শরীফের বিপরীত) মুখ করিয়া নামায পড়িতেন। কিন্তু সর্বদাই তিনি কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়ার প্রতি আকাঙ্খিত থাকিতেন। (আল্লাহ তায়ালা তাঁহার এই আকাঙ্খা পূর্ণ করতঃ ষোল বা সতর মাস পর নূতন হুকুম প্রবর্তন করিলেন যে, কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়ুন।) এই হুকুমের পর নবী (দঃ) (স্বীয় মসজিদে) সর্বপ্রথম আছরের নামায সকলকে লইয়া কা'বা শরীফের দিকে পড়িলেন। এক ব্যক্তি (নূতন প্রথায়) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িয়া অন্য এক মহল্লার মসজিদের নিকট দিয়া যাইতেছিল, ঐ মসজিদের মুছল্লিগণ পূর্ব নিয়মানুযায়ী বাইতুল-মোকাদ্দসের দিকে নামায পড়িতেছিলেন। তাঁহারা রুকু অবস্থায় থাকাকালে ঐ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলিল, আমি শপথ করিয়া সাক্ষ্য দিতেছি এইমাত্র আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মক্কামুখী হইয়া নামায পড়িয়া আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া ঐ নামাযীগণ রুকু অবস্থায়ই মক্কা শরীফের দিকে ফিরিয়া গেলেন।

● মদীনার অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল ইহুদী; তাহাদের কেবলা ছিল বাইতুল-মোকাদ্দাস। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বাইতুল-মোকাদ্দসের দিকে নামায পড়ায় এতদিন তাহারা গর্বিত ও সন্তুষ্ট ছিল। এখন যখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি কা'বামুখী হইয়া নামায পড়ার আদেশ হইল, ইহুদিরা তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া নানা

প্রকার অযথা প্রশ্নাবলীর অবতারণা আরম্ভ করিয়া ছিল। (কিন্তু পূর্বাহ্নেই আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে ঐ সকল প্রশ্নকারীদিগকে জ্ঞানশূন্য বোকা আখ্যায়িও করিয়া তাহাদের অযথা প্রশ্নাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং উহার উত্তর দান করিয়াছিলেন*)।

ছাহাবীগণের মধ্যে কয়েকজন এই নূতন প্রথা প্রবর্তন হইবার পূর্বেই বাইতুল-মোকদ্দছ মুখী হইয়া নামায পড়াকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্পর্কে ছাহাবীদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হইল যে, (তাঁহারা শুধু অস্থায়ী কেবলার দিকে মুখ করিয়াই নামায পড়িয়া গিয়াছেন, স্থায়ী কেবলা লাভের সুযোগ তাঁহারা পান নাই, সুতরাং) তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে। তখন এই আয়াত নাযেল হয়—وما كان الله ليضيع ايمانكم "আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করিবেন না"। (২ পারা ১ রুকু)

ব্যাখ্যা ঃ— বাহ্যতঃ এই আয়াতে "ঈমান" শব্দটির উদ্দেশ্য নামায। কারণ নামায সম্পর্কীয় একটা ভাবনা খণ্ডনেই এই আয়াত নাযেল হয়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, নামায ঈমানের একটি এমনই অপরিহার্য্য অঙ্গ যে, কোরআন শরীফে নামাযকে সরাসরি ঈমান বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। তবে প্রকাশ্যে নামায শব্দের পরিবর্তে ঈমান শব্দ ব্যবহার করারও একটি নিগুঢ় তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা এই যে, বাইতুল-মোকাদ্দসমুখী হইয়া নামায পড়ার আদেশ থাকাকালীন যাহারা সেই দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা একমাত্র ঈমান তাকিদে তথা আল্লার প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার দরুনই তাঁহার আদেশানুযায়ী ঐ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐ নামাযকে যদি বরবাদ ও বিফল গণ্য করা হয়, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের ঈমানকেই বিফল গণ্য করা হইবে। কারণ, তাঁহারা ঐ সময় একমাত্র আল্লাহ ও তাঁহার আদেশের প্রতি ঈমানের অনুরাগেই বাইতুল-মোকাদ্দসমুখী হইয়া নামায পড়িয়াছিলেন। এই বিষয়টি বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই উক্ত আয়াত নাযেল হয় যে—তাহাদের ঐ নামাযকে বিফল সাব্যস্ত করার অর্থ প্রকারান্তরে তাহাদের ঈমানকেই বিফল গণ্য করা হইবে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কখনও তোমাদের (মোসলমানদের) ঈমানকে বিফল ও নিরর্থক করিবেন না।

---

* কোরআন শরীফের দ্বিতীয় পারা ঐ বিষয়েই আরম্ভ হয়। আল্লাহ বলেন—"অচিরেই যখন কেবলা পরিবর্তনের আদেশ আসিবে, তখন একদল নির্বোধ লোক এই প্রশ্ন করিবে যে, কোন্ জিনিস মোসলমানদের কেবলার পরিবর্তন সাধন করিল? আপনি বলিয়া দিন—(আল্লার আদেশই এই পরিবর্তনের একমাত্র কারণ। ইহার উপর আর কোনও প্রশ্ন আসিতে পারে না। কারণ) সকল দিকের মালিকই একমাত্র আল্লাহ ঃ (তিনি যখন যে দিক্‌কে ইচ্ছা কেবলা নির্দিষ্ট করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও কোনরূপ প্রশ্নের অধিকার নাই। এইভাবে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা-সূত্রের উত্তর দানের পর নিপুণ রহস্যময় উত্তর দিয়া) আল্লাহ আরও বলেন—"কেবলা পরিবর্তন আদেশের মাধ্যমে আমি দেখিতে চাই, কোন্ ব্যক্তি (স্বীয় পূর্ব প্রথার ব্যতিক্রম দেখিয়া) রসুলের (দঃ) অনুসরণ হইতে ফিরিয়া দাঁড়ায়। ইহার দ্বারাই প্রমাণ হইবে যে—কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলের (দঃ) আদেশের অনুসারী এবং কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র রীতি ও প্রথার অনুরাগী"।

খাঁটি ইসলামের উপকারিতা

৩৭। হাদীছ ঃ— سمع ابو سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

اِذَا اَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ اِسْلَامُهٗ يُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَّفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِاَةِ ضِعْفٍ وَّالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا اِلَّا اَنْ يَّتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهَا ـ

অর্থ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, কোন মানুষ যখন ইসলাম কবুল করে এবং তাহার ইসলাম-গ্রহণ খাঁটী ও পূর্ণাঙ্গ হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেন। পূর্বের হিসাব পরিষ্কার হওয়ার পরমুহূর্ত (তথা ইসলাম গ্রহণের পর) হইতে তাহার জন্য কার্য্যানুপাতিক প্রতিফল এই হিসাবে দান করা হয় যে, নেক কার্য্যে এক-এর পরিবর্তে দশ হইতে সাত শত গুণ পর্য্যন্ত এবং গোনাহের কাজে সমান সমান (এক-এর পরিবর্তে একই) প্রতিফল দান করা হয়। কিন্তু যদি আল্লাহ তাহার গুনাহ মাফ করিয়া দেন, (তবে উহার কোনই প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে না)।

৩৮। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

اِذَا اَحْسَنَ اَحَدُكُمْ اِسْلَامَهٗ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَّعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهٗ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِاَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَّعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهٗ بِمِثْلِهَا ـ

অর্থ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ খাঁটী ও পূর্ণাঙ্গ হইবে, তাহার প্রতিটি নেক আমলের ছওয়াব দশ হইতে সাত শত গুণ পর্য্যন্ত লেখা হইবে এবং গোনাহের কাজে সমান গোনাহ হইবে।

আল্লার নিকট ঐ পরিমাণ আমল অধিক পছন্দনীয় যাহা সর্বদা পালন করা যায়।

৩৯। হাদীছ ঃ—একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার গৃহে আসিয়া দেখিলেন, তথায় অন্য একটি মহিলা বসিয়া আছে। নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মহিলাটি কে? আয়েশা (রাঃ) তাহার পরিচয় বলার সঙ্গে ইহাও বলিলেন, এই মহিলাটি রাত্রিভর তাহাজ্জুদ নামায পড়েন—নিদ্রা যান না। ইহা শুনিয়া

নবী (ঃ) বলিলেন—এরূপ করা ভাল নয়; তোমরা এই পরিমাণ আমল অবলম্বন করিবে, যাহা সদা সর্বদা পালন করিতে পার। তিনি শপথ করিয়া ইহাও বলিলেন যে, (তোমরা বেশী পরিমাণ আমল করিলে) অবশ্য আল্লাহ তায়ালা ছওয়াব দান করিতে ক্লান্ত বা কুণ্ঠিত হইবেন না, কিন্তু (অবশেষে) তোমরাই ক্লান্ত হইয়া ঐ আমল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে। যে পরিমাণ আমলকে সর্বদা বজায় রাখিয়া চলা যায় উহাই আল্লার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

ব্যাখ্যা ঃ—আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের জন্য কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, আল্লার জিক্‌র-তছবীহ, নফল নামায-রোযা ইত্যাদি কিছু আমল অজিফা তথা সর্বদার অভ্যাসরূপে অবলম্বন করা আবশ্যক এবং উহা এই পরিমাণ অবলম্বন করা ভাল, যাহা যৌবনে ও বৃদ্ধাবস্থায়—সব সময়েই বজায় রাখা সহজ হয়। অতি মাত্রার এবাদত স্বভাবতঃই ক্লান্তি বশতঃ কিছুদিন পরে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হওয়া নিশ্চিত। সুতরাং অধিক মাত্রায় অস্থায়ী এবাদৎ অপেক্ষা অল্প মাত্রায় স্থায়ী এবাদৎ অধিক পছন্দনীয়। কারণ, শেষফলে ইহারই পরিমাণ বেশী দাঁড়াইবে। কচ্ছপ ও খড়গোসের প্রতিযোগিতার গল্প লক্ষ্যণীয়।

আমলের পরিপ্রেক্ষিতে ঈমানের মাত্রা কম-বেশী হয়

৪০। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—"মোওয়াহ্‌হেদ" বা মোমেনদের মধ্যে (যাহারা পাপী এবং পাপের শাস্তি ভোগে যাহাদিগকে দোযখে যাইতে হইয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে শাস্তি ভোগ করার পর) সর্ব প্রথম ঐ ব্যক্তিকে দোযখ হইতে বাহির করা হইবে যাহার অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমানের অস্তিত্ব থাকিবে। তারপর যাহার অন্তরে গমের দানা পরিমাণ ঈমান থাকিবে। তারপর যাহার অন্তরে চীনার দানা পরিমাণ বা অণু পরিমাণ ঈমান মওজুদ থাকিবে।

পাঠকবর্গ! উল্লেখিত বর্ণনার লোকেরা সকলেই একত্ববাদী মোমেন, অথচ তাহাদের ঈমানের পরিমাণ পরস্পর কম-বেশী দেখা যাইতেছে। ইহা শুধু তাহাদের আমলের কম-বেশীর দরুনই হইবে।

৪১। **হাদীছ ঃ**—একদা এক ইহুদী ব্যক্তি খলীফা ওমর (রাঃ)কে বলিল, আপনাদের কোরআনের মধ্যে (মোসলেম জাতির জন্য অতি বড় সুসংবাদের) একটি আয়াত রহিয়াছে। আমাদের ইহুদী জাতির জন্য যদি ঐরূপ একটি আয়াত নাযেল হইত তবে আমরা ঐ (সুসংবাদের) দিনটিকে (চিরস্মরণীয় করার জন্য) ঈদের দিন বানাইতাম। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কোন্ আয়াত? ইহুদী বলিল—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"হে মানব জাতি। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন ও ধর্মকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত* সম্পূর্ণ করিয়া দিলাম, আর আমি তোমাদের জন্য একমাত্র ইসলামকেই দ্বীন ও ধর্মরূপে পছন্দ ও মনোনীত করিলাম। (৬ পাঃ ৫ রুঃ)

ওমর (রাঃ) বলিলেন—কোন্ দিন কোন্ স্থানে এই আয়াতটি নাযেল হইয়াছিল তাহা আমরা ঠিক ঠিক রূপে জানিয়া রাখিয়াছি। (বিদায় হজ্জে) রসুলুল্লাহ (দঃ) আরাফার ময়দানে উপবিষ্ট থাকাবস্থায় জুম্আ'র দিন এই আয়াতটি নাযেল হইয়াছিল। (অর্থাৎ এই আয়াত নাযেল হওয়ার দিনটি আমাদের ধর্মে পূর্ব হইতেই দুই ঈদ-বিশিষ্ট† দিনরূপে নির্দিষ্ট রহিয়াছে, সুতরাং নূতনভাবে ঐ দিনকে ঈদের দিনে পরিণত করার প্রয়োজন আমাদের নাই।

● উল্লিখিত আয়াতটির দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইল যে, শরীয়তের হুকুম-আহকাম আদেশ-নিষেধাবলী সম্পূর্ণ করাকেই দ্বীন সম্পূর্ণ করা বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহার মধ্যে যাহার যতটুকু ত্রুটি থাকিবে তাহার দ্বীনও ততটুকু অসম্পূর্ণ থাকিবে এবং যাহার মধ্যে ঐ হুকুম-আহকাম যে পরিমাণে পূর্ণ হইবে তাহার দ্বীনও সেই পরিমাণে উর্দ্ধে উঠিবে—ততটুকু পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

যাকাৎ দান করা ইসলামের একটি অঙ্গ

৪২। হাদীছঃ—তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নজদবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। সুদূর প্রান্ত হইতে ছফর করিয়া আসায় তাঁহার মাথার চুল এলোমেলো অবস্থায় ছিল। তিনি বিড় বিড় করিয়া কিছু বলিতেছিলেন। আমরা শুধু বিড় বিড় শব্দই শুনিতেছিলাম, কিন্তু কোন কিছুই বুঝিতেছিলাম না যে, তিনি কি বলিতেছেন। নিকটবর্তী হইলে পর বুঝা গেল, তিনি ইসলামের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, ইসলামের অঙ্গ কি কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, রাত্র-দিন চব্বিশ ঘণ্টায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন, ইসলামের অঙ্গ হিসাবে আমার যিম্মায় এই পাঁচ ওয়াক্তের অতিরিক্ত আরও কোন ফরয নামায আছে কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—না। অবশ্য ফরয না থাকা সত্ত্বেও যদি আপনি ইচ্ছা করিয়া অতিরিক্ত কিছু নামায পড়েন (তবে উহা ইসলামের অঙ্গই হইবে বটে, কিন্তু ফরয অঙ্গ নহে, বরং নফল অঙ্গ)। তৎপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন এবং

---

* এখানে "নেয়ামত" শব্দ দ্বারা দ্বীন-ইসলামকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মাধ্যমে দীর্ঘ তেইশ বৎসর ব্যাপী ইসলামের সমস্ত আহকাম বিস্তারিতভাবে শিক্ষাদান করিয়া এবং মক্কা তথা সমগ্র আরব জাহানকে মোসলমানদের করতলগত করিয়া দিয়া বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা জাহেরী ও বাতেনী (ভিতর বাহির) দুইদিক দিয়াই তাঁহার একমাত্র মনোনীত দ্বীন-ইসলামকে সম্পূর্ণতা দান করতঃ মোসলেম জাতির উপর অতি বড় কৃপাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

† শুক্রবার সাপ্তাহিক ঈদ আর ৯ই জিলহজ্জ দিনটি মহান হজ্জের আসল দিন এবং এই দিনটিই ঈদুল-আজহার প্রকৃত মূল যাহা পরবর্তী দিনে উদযাপিত হয়।

পূর্ণ রমজান মাসের রোযা রাখা (ইহাও ইসলামের একটি ফরয অঙ্গ)। আগন্তুক পুনরায় তদ্রূপই জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা ব্যতীত অন্য কোনও রোযা আমার উপর ফরয আছে কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—না। অবশ্য আপনি যদি ইচ্ছা করিয়া নিজ খুশিতে অতিরিক্ত কিছু রোযা রাখেন (তবে উহা ইসলামেরই নফল অঙ্গ হইবে)। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে যাকাতের বিষয়ে বলিলেন। আগন্তুক এবারও ঐরূপ প্রশ্ন করিলেন যে, যাকাতের ব্যাপারে আমার উপর অন্য আর কিছু ফরয আছে কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—না। অবশ্য আপনি যদি নিজের খুশিতে ও আগ্রহভরে দান-খয়রাত করেন (তবে উহা ইসলামের নফল অঙ্গ স্বরূপ হইবে।) অতঃপর ঐ ব্যক্তি এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন যে, কসম খোদার—আমি এ সবের মধ্যে একটুকুও বেশ-কম করিব না; (পূর্ণ মাত্রায় ঠিক ঠিক রূপে এই সকল আহকাম আদায় করিব।) রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যদি সে তাহার কথার উপর অটল থাকে, তাহা হইলে তাহার নাজাত অনিবার্য্য এবং তাহার জীবন নিশ্চিতরূপে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

জানাযার সৎকারে* যোগদান করা ঈমানের একটি অঙ্গ

৪৩। হাদীছঃ— عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطٍ-

অর্থঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ও ছওয়াবের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া কোনও মোসলমানের জানাযার সহগামী হইবে এবং জানাযার নামায ও দাফন কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সঙ্গেই থাকিবে, সে ব্যক্তি দুই "ক্বীরাত" ছওয়াব —প্রত্যেক "ক্বীরাত" ওহোদ পাহাড় সমান, হাসিল করিয়া বাড়ী ফিরিবে। আর যে ব্যক্তি দাফন কার্য্য সমাধার পূর্বেই শুধু নামায পড়িয়া চলিয়া আসিবে সে এক "ক্বীরাত" পরিমাণ ছওয়াব লাভ করিবে।

এই হাদীছটি আয়েশা (রাঃ) নবী (দঃ) হইতে শুনিয়াছেন। এই হাদীছ শ্রবণে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, পূর্বে আমি বহু সংখ্যক কিরাত ছওয়াব

* মোসলমান মৃতের গোছল দেওয়া, কাফনের কার্য্য সমাধা করা এবং জানাযার নামায পড়িয়া শবদেহ বহন করিয়া গোরস্থানে লইয়া যাওয়া তারপর দাফন কার্য্য সমাধা করা সবই ইহার অন্তর্ভুক্ত।

হেলায় হারাইয়াছি। তিনি উক্ত হাদীছ জ্ঞাত হওয়ার পূর্বে অনেক সময় দাফনে শামিল না থাকিয়া শুধু জানাযার নামায পড়িয়াই চলিয়া আসিতেন। (১৭৭ পৃঃ)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ সম্পর্কে ভূমিকা ঃ

ইসলাম ও ঈমানের উন্নতির দিক একটি হইল জাহেরী বা স্থূল উন্নতি, অপরটি হইল বাতেনী বা আধ্যাত্মিক উন্নতি।

স্থূল উন্নতিগুলি মোটামুটি এই—(১) দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা অনুষ্ঠিত কতকগুলি আমল, (২) বাক্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন স্বীকারোক্তি এবং (৩) অন্তরের কতিপয় বিশ্বাস।

প্রকৃত প্রস্তাবে ঈমানের এই স্থূল দিকটা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। কারণ, মানুষের দেহ ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং দৈহিক শক্তিসমূহ সবই আদি ও অন্ত উভয় দিক হইতেই সীমাবদ্ধ। তাই উহা দ্বারা সংঘটিত আমল সমূহও নেহাৎ সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে মানুষের নিরাকার আত্মা যদিও আদির দিক হইতে সীমাবদ্ধ, কিন্তু অন্তের দিক হইতে উহা অসীম অক্ষয় অব্যয় এবং অমর। মানুষের এই অদৃশ্য নিরাকার অসীম ও অমর আত্মার ক্রিয়াও দুই প্রকার। সীমাবদ্ধ এবং সীমাহীন। সীমাবদ্ধ প্রকার ক্রিয়া হইল—কতিপয় প্রকৃত সত্যের প্রতি অকাট্যরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জীবন যাত্রা আরম্ভ করা। ইসলাম মানুষকে কতিপয় প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিয়া সেই সত্যগুলিকে অবিচলিতরূপে বিশ্বাস করার নির্দেশ দিয়াছে। যথা—(১) আল্লাহ একজন আছেন—তিনি সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, পানাহার দাতা, বিধানকর্তা ও বিচারকর্তা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলীর সহিত আল্লার অস্তিত্বে ও একত্বে অটলরূপে বিশ্বাসী হইতে হইবে।

তদুপরি মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য নিষ্পাপ ফেরেশতার দ্বারা নির্ভুল কিতাব (কোরআন শরীফ) নিষ্পাপ রসুলের মাধ্যমে বিশ্ব-মানবের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন এবং নিষ্পাপ রসুল স্বীয় ব্যবহারিক জীবনের কার্য্যাবলীর দ্বারা সেই কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া নির্ভুল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাই (২) আল্লার কিতাব, (৩) আল্লার ফেরেশতা এবং (৪) আল্লার রসুল ও তাঁহার আদর্শের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অক্ষম অচেতন জড় পদার্থরূপে সৃষ্টি করেন নাই, বরং তাহাকে পরিমাণ মত ইচ্ছাশক্তি এবং কর্মশক্তি দান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, মানুষ তাহার লব্ধশক্তি সমূহের সদ্ব্যবহার করিয়াছে কি অসদ্ব্যবহার করিয়াছে, ইহার হিসাব লওয়ার জন্য একটি সময়ও ধার্য করিয়া রাখিয়াছেন, উহাকেই বলা হয় আখেরাত বা পরকাল। সেই হিসাব-পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে তাহাকে বেহেশত দান করিয়া পুরস্কৃত করা হইবে এবং অকৃতকার্য্য প্রমাণিত হইলে দোযখে শাস্তি দেওয়া হইবে। তাই (৫) আখেরাতের হিসাব-নিকাশ এবং (৬) বেহেশত-দোযখের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত ছয়টি বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যদিও মানুষের আত্মা সম্পর্কিত ক্রিয়া বটে, কিন্তু এসবই উহার প্রাথমিক ও সীমাবদ্ধ ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই সকল প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদি ও বিশ্বাস সমূহের দ্বারা মানুষ তাহার জীবন যাত্রা আরম্ভ করিবে মাত্র। সুতরাং এই সকল বিশ্বাসের মধ্যে বিন্দুমাত্র শিথিলতা বা নড়চড় হইলে তাহার সামগ্রিক জীবন সৌধেরই ভিত্তিমূল নড়চড় হইয়া পড়িবে। ফলে সে তাহার ইসলামী জীবনের ইমারত রচনায় অগ্রসর হইতে কিম্বা উহার সাধনা করিতে সক্ষম হইবে না।

এ পর্য্যন্ত আলোচনার দ্বারা স্পষ্টতঃই বুঝা গেল যে—ইসলাম ও ঈমানের স্থূল উন্নতির মোটামুটি যে তিনটি বিষয়বস্তু রহিয়াছে, উহার প্রথম ও দ্বিতীয়টি বাহ্যিক অঙ্গ সম্পর্কিত ক্রিয়া হওয়া বিধায় যেমন সীমাবদ্ধ, তদ্রূপ তৃতীয় বিষয়টি আত্মার ক্রিয়া হওয়া সত্বেও উহা সীমাবদ্ধ এবং শুধু প্রাথমিক ক্রিয়া মাত্র।

ইহার পরেই আরম্ভ হয় মানুষের অসীম আত্মার সীমাহীন উন্নতির পর্য্যায় এবং উহাকেই বলা হয়, ইসলাম ও ঈমানের বাতেনী বা আধ্যাত্মিক উন্নতি। এই পর্য্যায়ের উন্নতির দিকটা অতিশয় বিস্তীর্ণ ও বিশাল, শুধু বিশালই নহে বরং সীমাহীনও। এই অন্যতম প্রধান বস্তু হইতেছে—আল্লার খাঁটী এশ্‌ক বা প্রেম। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালাই পবিত্র কোরআনে বলেন—والذين امنوا اشد حبا لله অর্থাৎ—"প্রকৃত ও পূর্ণ ঈমানদার যাঁহারা তাঁহারা খাঁটীভাবে আল্লার প্রেমিক হইয়া থাকেন" (১ পাঃ ৩ রুঃ)।

এরূপ প্রেমিক তাঁহারা যে, আল্লার প্রেমের সঙ্গে অন্য প্রেমের মিশ্রণ বা ভেজাল তাঁহাদের অন্তরে মোটেই নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত প্রেমের একনিষ্ঠতা প্রমাণিত না হইবে ততক্ষণ প্রেমকে খাঁটী বলা যাইতে পারে না ; একনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে অকৃত্রিম আনুগত্যেরও বিশেষ দরকার। ঈমানের স্থূল উন্নতির বিষয়বস্তুগুলির ভিতর দিয়াই সেই একনিষ্ঠতা ও অকৃত্রিম আনুগত্যের বিকাশ হইয়া থাকে। যথা—নামায (ভজন), রোযা (সংযম সাধনা), যাকাত (জন-সেবা), হজ্জ (আল্লার নির্দ্ধারিত কেন্দ্রে সকলে সমবেত ভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়া আল্লার আনুগত্যের এবং প্রেমের পরিচয় দেওয়া), জেহাদ (আল্লার হুকুমত কায়েম করার জন্য জান-মাল কোরবান করা) ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যদি এই সবের ভিতর দিয়া প্রেমিকের অন্তরে এরূপ আত্মতৃপ্তি, এতটা অহমিকতা আসিয়া যায় যে—সে স্বীয় কার্য্যকলাপের দ্বারা এরূপ নির্লিপ্ত ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে যে, তাহার অন্তরে প্রেমাস্পদের অসন্তোষের কোন ভয়ই আর উদিত হয় না, অথবা প্রেমাস্পদের তরফ হইতে তাঁহার সন্তুষ্টির নিদর্শন স্বরূপ পুরস্কারের প্রতি ঐকান্তিক আসক্তি ও অদম্য স্পৃহা জন্মে না, তবে সেই প্রেম কখনও প্রকৃত একনিষ্ঠ খাঁটী প্রেম নহে, বরং উহা কৃত্রিম এবং নামে মাত্র প্রেম বলিয়াই গণ্য হইবে। খাঁটী প্রেমের অধিকারী এবং প্রকৃত প্রেমিক হইতেছে ঐ ব্যক্তি যে প্রেমাস্পদের সন্তোষ বিধানের জন্য অকাতরে সব কিছু করিয়াও এক পলকের তরেও

তাঁহার অসন্তুষ্টির ভীতি হইতে নিশ্চিন্ত অথবা নির্লিপ্ত হইতে পারে না। কারণ, খাঁটী প্রেমের তেজস্ক্রিয়া এতই তীব্র যে, উহার গ্রাসে সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়াও আত্মতৃপ্তি লাভ হইতে পারে না। তাই প্রেমিকের মনে সদা সর্বদা অসম্পূর্ণতাবোধ এবং যথোপযুক্তরূপে প্রেমাস্পদের জন্য হক আদায় না করিতে পারার চিন্তাই অনুক্ষণ জাগরিত হইতে থাকে। এই বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফেও এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ -

অর্থাৎ—খাঁটী ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানদারদের অবস্থা এই যে, তাঁহারা আল্লার কাজ করিয়া কখনই গর্বিত হন না আত্মশ্লাঘাও অনুভব করেন না, বরং সর্বদাই তাঁহারা বিনয় ও নম্রতায় জড়সড় এবং ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকেন এই ভাবিয়া যে, আল্লার কার্য্যের যথাযোগ্য হক আমার দ্বারা আদায় হইল কি না। তাঁহারা আল্লার রাস্তায় যথাসাধ্য দান করেন, সাধ্যানুসারে আল্লার হুকুম-আহকাম পালন করেন এবং যথোচিতরূপে এবাদৎ-বন্দেগীও করিয়া থাকেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁহাদের অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপিতে থাকে এই ভাবিয়া যে, তাহাদিগকে একদিন স্বীয় প্রভুর দরবারে হাজির হইতে হইবে ও স্বীয় কৃতকর্মের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জওয়াবদেহী করিতে হইবে। না-জানি সেখানে কোন বিষয়ে কোন গোপন সূক্ষ্ম ত্রুটির কারণে বা কোন সূক্ষ্মতম উপধারা লঙ্ঘনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইতে হয় না কি। (১৮ পাঃ ৪ রুঃ)

প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁহারা আধ্যাত্মিক দিক দিয়া উন্নতি লাভ করিয়া চলেন, তাঁহারা কখনই স্বীয় কৃতকার্য্যতার দিকে তথা পিছপানে ফিরিয়া তাকাইবার ফুরছত বা সুযোগই পান না। তাঁহাদের দৃষ্টি সর্বদা উন্নতির দিকে তথা ঊর্দ্ধ দিকে এবং সম্মুখ পানেই নিবদ্ধ থাকে। প্রেমাস্পদের অসন্তুষ্টির ভীতি ও প্রেমপাত্রের সন্তুষ্টির কামনা, বাসনা ও স্পৃহা লইয়া তাঁহারা সর্বদা উন্নতির ময়দানে সম্মুখ পানে ধাবিত হইতে থাকেন। এ সম্পর্কে কোরআন শরীফে ছুরা আম্বিয়াতে তের জন পয়গাম্বরের সাধনাময় জীবন-কাহিনী বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا - وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ

অর্থাৎ "তাঁহারা (পূর্বোল্লিখিত নবীগণ) সকলেই নেক কার্য্যাবলীর প্রতি অত্যন্ত আগ্রহশীল ও উৎসাহী ছিলেন এবং সৎকার্যাদি যথাসাধ্য শীঘ্র সমাধা করার জন্য আজীবন অতি মাত্রায় ব্যস্ত থাকিতেন এবং তাঁহারা আমার ভয় অন্তরে পোষণ করিয়া ও আমার ছওয়াবের (পুরস্কার দানের) প্রতি লালায়িত থাকিয়া আমার এবাদত-বন্দেগীতে সদা-নিরত থাকিতেন এবং আমার নিকট ভয়াতুর, সদাবিনয়ী, অহমবর্জিত ও বিনম্র থাকিতেন।"

(১৭ পাঃ ৪ রুঃ)

ইহাই হইতেছে খাঁটী প্রেম তথা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই উন্নতির ক্ষেত্র অতি বিশাল, শুধু বিশালই নহে বরং সীমাহীন; ইহার কুল-কিনারা নাই। কারণ, ইহার মূল বস্তু হইল এশক বা প্রেম। আর এশক ও প্রেম সকল প্রকার রূপ রেখা এবং ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে এমনই এক বস্তু, যাহার কোনই সীমা পরিসীমা নাই, কুল নাই কিনারাও নাই।

খাঁটী প্রেমিকদের উৎসাহ, উদ্যম, কার্য্য-প্রণালী ও চিন্তাধারা সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক উর্দ্ধে, যাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কেহ অনুভব ও অনুমান করিতে পারে না। তাঁহাদের অনুভূতি অতিশয় তীক্ষ্ণ ও গভীর হইয়া থাকে। যেমন, একদা কোনও এক প্রেমিক ব্যক্তি রাত্রিকালে নিদ্রা উপভোগ করিতেছিল। গভীর রাত্রে একটি কপোতের ক্রন্দন সুরে হঠাৎ তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; তখন সে ভীষণ অনুতপ্ত হইয়া আক্ষেপের সুরে বলিল—

لقد هتفت فى جنح ليل حمامة — على فنن وهنا وانى لنائم
وازعم انى هائم ذو صبابة — بسعدى ولا ابكى وتبكى الحمائم
كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا — لما سبقتنى بالبكاء الحمائم

অর্থাৎ—"গভীর রাত্রে এই কপোতটি গাছের ডালে বসিয়া তাহার প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদ যাতনায় কাঁদিতেছে, আমি নিদ্রার কোলে অচেতন! আমি প্রেমিক বলিয়া দাবী করি, অথচ প্রেমাস্পদের জন্য আমার ক্রন্দন নাই, কিন্তু কপোত ক্রন্দন রত? খোদার কসম! নিশ্চয়ই আমি কপট ও কৃত্রিম, নতুবা কপোত আমার আগে কাঁদিতে সক্ষম হইত না।"

খাঁটী প্রেমিক তথা আধ্যাত্মিক উন্নতিকামীগণ সম্মুখে উন্নতির বিশাল সমুদ্র দৃষ্টে নিজেদের অকিঞ্চিৎকর সাধনা ও সিদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করিয়া এরূপ ধারণা পোষণ করিতে থাকেন যে—আমিত এখনও কিছুই করিতে পারি নাই। কারণ, বিশাল সমুদ্রের তুলনায় লক্ষ লক্ষ মণ পানিও বিন্দুবৎ নগণ্যই মনে হইয়া থাকে। তাই তাঁহারা ভাবেন যে, আমিত এখনও বিন্দু পরিমিত উন্নতিও হাসিল করিতে পারি নাই। আমার কার্য্যক্রম অত্যন্ত নগণ্য, অথচ আমি মোমেন তথা আল্লার প্রেমিক বলিয়া দাবী করিয়া থাকি। দেখা যায়, আমার কাজের চেয়ে কথা অনেক বেশী ও বড়। সুতরাং তাঁহারা অনেক সময় এরূপ বলিয়াও ফেলেন যে, আমি মোনাফেক (কপটচার)-এর পর্য্যায়ভুক্ত বটে। এমনকি, এ-পর্য্যায়ের ভয়-ভীতির নিকট পরাজিত হইয়া অনেক কাঁচা বয়সের প্রেমিকগণ আত্মহত্যা পর্যন্ত করিয়া বসেন। কিন্তু পাকা বয়সের প্রেমিকগণ ঐ ভয়-ভীতির নিকট ঐরূপ শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন না, বরং তাঁহারা চেষ্টা ও সাধনার ময়দানে অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে থাকেন। তাঁহারা কোথাও থামেন না, তাঁহাদের জেহাদ মোজাহাদা ত্যাগ তিতীক্ষা ও সাধনা ক্ষান্ত হয় না, অবিরাম গতিতে চলিতেই থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও রূহানী শক্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মাওলানা রুমী ইহার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন—

اے برادر بے نہایت در گہیست — ہرچہ بروے می رسی بروے مایست

"হে ভ্রাতা! খাঁটী প্রেম তথা আধ্যাত্মিক উন্নতির ময়দান অতি বিশাল ও সীমাহীন—উহার কুল কিনারা নাই। যতটুকু অগ্রসর হইতে পার, হইতে থাক; কোথাও ক্ষান্ত হইও না।"

ইমাম বোখারী (রঃ) প্রথমে ঈমানের অনেকগুলি ছোট বড় অঙ্গ বা শাখা প্রশাখা বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—নামায, রোযা, যাকাৎ, হজ্জ প্রভৃতি এবং লাইলাতুল-কদরের এবাদৎ, তারাবীর নামায ও জানাযার সৎকারে যোগদান করা ইত্যাদি। এ সবই সীমা নির্দ্ধারিত ও নির্দিষ্ট আইন-কানুন পর্য্যায়ের বিষয়াবলী। এ সবের দ্বারা প্রথম দিক—অর্থাৎ ঈমানের স্থূল বা যাহেরী উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। নিম্নের পরিচ্ছেদ ও শিরোনামায় ইমাম বোখারী (রঃ) দ্বিতীয় দিক—অর্থাৎ ইসলাম ও ঈমানের আধ্যাত্মিক উন্নতির সন্ধান দিতেছেন এবং বড় বড় আল্লাহওয়ালা—বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন মূল্যবান উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এখানে প্রমাণ করিতেছেন যে—তাঁহারা কত খাঁটী প্রেমিক ছিলেন। মাশুকে-হাকীকী বা প্রকৃত প্রেমাস্পদ আল্লার প্রেম তাঁহাদের অন্তরে কত অধিক গাঢ় ছিল এবং একমাত্র সেই প্রেমের কারণেই তাঁহাদের মধ্য হইতে সকল প্রকারের গর্ব ও অহমিকা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া তাঁহাদের অন্তরে আল্লার ভয়-ভীতি কত প্রবল ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত ছিল।

আল্লার মহব্বৎ এবং তদ্দরুন আতঙ্ক যে, অজ্ঞাতে নেক আমল বরবাদ হইয়া যায় নাকি! ইহা ঈমানের অঙ্গ ঃ

ইব্রাহীম তাইমী (রঃ)† বলিয়াছেন—আমি যখনই আমার কথাকে (মোমেন হওয়ার দাবী) আমার আমলের সহিত তুলনা করিয়া দেখি, তখনই আমার মনে হয় যে, আমি মোনাফেক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া যাই নাকি! কারণ, আমি স্বীয় কথা ও কার্য্যের অসামঞ্জস্যের দ্বারা নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করিতেছি।

ইবনে আবী মোলায়কা (রঃ)‡ বর্ণনা করিয়াছেন—আমি ত্রিশজন ছাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাতের ও তাঁহাদের সাহচর্য্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছি। তাঁহাদের প্রত্যেককেই দেখিয়াছি, তাঁহারা সর্বদা এই ভয়ে ভীত থাকিতেন যে, তাঁহারা মোনাফেক শ্রেণীভুক্ত হইয়া যান নাকি। (কেননা তাঁহারা ত মধ্যাহ্নের আলোকোজ্জল দীপ্ত সূর্য্য অর্থাৎ রসুলুল্লাহর (দঃ) সময়ের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহার তুলনায় পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোৎস্নাও

---

† ইব্রাহীম তাইমী (রঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগের নিকটবর্তী ৯২ হিজরীর একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী।

‡ ইবনে আবী মোলায়কা (রঃ) ১১৭ হিজরীর একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী ছিলেন। আয়েশা (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখ বহু ছাহাবীর শিষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন তিনি।

অন্ধকার বলিয়া মনে হয়×)। তাঁহাদের কাহাকেও ঈমানের, পরহেজগারীর গর্ব ও বড়াই করতঃ এরূপ উক্তি করিতে শুনি নাই যে—আমার ঈমান জিব্রাঈল অথবা মিকাঈল ফেরেশতার ঈমানের সমতুল্য।

হাসান বছরী (রঃ)+ বলিতেন— (আমি যেই আল্লার তৌহিদের কলেমা পড়িয়া মোসলমান হইয়াছি সেই আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, যত মোমেন অতীত হইয়াছেন ও বর্তমানে আছেন এবং ভবিষ্যতে হইবেন, সকলেই মোনাফেকীর ভয়ে ভীত ও চিন্তিত *। পক্ষান্তরে যত মোনাফেক অতীত হইয়াছে ও বর্তমান আছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, সকলেই মোনাফেকী হইতে শঙ্কাহীন ও নিশ্চিন্ত। অতএব) মোমেন মাত্রই মোনাফেকে পরিগণিত হওয়ার ভয়ে সর্বদা আতঙ্কিত থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে যে ব্যক্তি মোনাফেক, কেবলমাত্র সে-ই মোনাফেকী হইতে নিঃশঙ্ক-চিত্ত থাকিতে পারে।

অতীত কাল হইতেই "মোরজেয়া" নামক একটি ফের্কা বা দলের আবির্ভাব হইয়া আসিয়াছে। তাহাদের মতবাদ ও বিশ্বাস এই যে, 'ঈমান অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস ঠিক থাকিলে অন্যান্য পাপ কার্য্যের দ্বারা ঈমানের কোনও ক্ষতি হইতে পারে না।" প্রথম দিকে যখন এই ফের্কার আবির্ভাব হয়, তখন কোন এক ব্যক্তি আবু ওয়ায়েল (রঃ) নামক বিশিষ্ট তাবেয়ীকে ঐ প্রকার মতবাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উহা ঠিক কিনা? আবু ওয়ায়েল (রঃ) বলিলেন, এরূপ মতবাদ ও উক্তি নিছক ভুল ও মিথ্যা। আমার ওস্তাদ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি নিজ কানে নিম্নে বর্ণিত হাদীছ শুনিয়াছেন—

৪৪। হাদীছঃ— عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَّقِتَالُهٗ كُفْرٌ

× এইরূপ বিষয়েরই আরও কিছু বিশদ বিবরণ ৫নং হাদীছের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

+ হাসান বছরী (রঃ) একজন বিশিষ্ট মর্তবার তাবেয়ী ছিলেন। ওমর (রাঃ)এর খেলাফতের সময় তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ১১০ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। বহু ছাহাবী হইতে তিনি এল্‌ম হাসিল করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তির কেবলমাত্র শেষ অংশটুকু ইমাম বোখারী (রঃ) উদ্ধৃত করিয়াছেন। অমূল্যরত্ন হিসাবে আমরা তাঁহার সম্পূর্ণ কথাটির অনুবাদ দিয়াছি। অতিরিক্ত অংশের অনুবাদ বন্ধনীর মধ্যে দিয়াছি।

* খাঁটী মোমেন মাত্রই তাঁহার মনে সর্বদা এই ভয় সংশয়ের উদয় হইবে যে, আমি মোমেন হওয়ার দাবী করিতেছি, মোমেনের লেবাছ-পোষাক পরিধান করিতেছি, মোমেনের সুরত-আকৃতি অবলম্বন করিতেছি—অথচ আমার আভ্যন্তরীণ চরিত্রকে ও আধ্যাত্মিক অন্তরাত্মাকে তদ্রূপ গড়িয়া তুলিতে পারিতেছি না। আমার ভিতরকে বাহির অনুযায়ী, স্বভাবকে সুরত অনুযায়ী, কার্য্যকে কথা অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণরূপে গড়িয়া তুলিতে পারিতেছিনা। এমতাবস্থায় আমি মানুষকে প্রতারণাকারী মোনাফেক কপটাচারী শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাই নাকি।

অর্থ :—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মোসলমান অপর মোসলমানকে গালি দিলে, সে ফাসেকের কাজ করিল বলিয়া সাব্যস্ত হয় এবং কোন মোসলমান অন্য মোসলমানের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি কাটাকাটি করিলে সে কাফেরের কাজ করিল বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

ব্যাখ্যা :—যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লার রসুলের (দঃ) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্বীয় অবাধ্যতা প্রকাশ করে তাহাকে ফাসেক বলে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুল (দঃ)কে অস্বীকার করে তাহাকে কাফের বলা হয়। সাধারণ পাপের চেয়ে ফাসেকী কার্য্যের পাপ অপেক্ষাকৃত বড় এবং কুফুরী কার্য্যের পাপ তার চেয়েও বড়। এই হাদীছের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, ঈমান শুধু দেলের বিশ্বাসের নামই নহে, বরং পাপের কাজ হইতে বিরত থাকাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। অধুনা অনেকে বলিয়া থাকে ধর্ম ব্যক্তিগত Private বস্তু; সুতরাং সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে পাপ করিলে তাহাতে ধর্মের কোন ক্ষতি হইবে না। কেননা, ধর্মের সঙ্গে এ সবের কি সম্বন্ধ? এইরূপ ধারণা বস্তুতঃ অতীতের সেই "মোরজেয়া" ফের্কার ব্যক্তিদের ভ্রান্ত ধারণারই অনুরূপ। আলোচ্য হাদীছটির দ্বারা ঐ ধারণার অসারতা প্রমাণিত হইল। পাপ কার্য্য নিশ্চয় ঈমানের ও ধর্মের ক্ষতি সাধন করে ইহাতে সন্দেহ নাই। পাপ কাজ হইতে তওবা ✽ না করিয়া মৃত্যু হইলে পরিণাম অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই কারণেই কোরআন শরীফে মোমেনদের পরিচয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ("যাঁহারা মোমেন) তাঁহারা সজ্ঞানে কখনও কৃত কুকর্মের উপর হট করেন না।" অর্থাৎ—কোন সময় কোনও কুকথা কুকাজ তাঁহাদের দ্বারা সংঘটিত হইয়া পড়িলে, উহার উপর এক-গুঁয়েমী বা জেদ না করিয়া যথাশীঘ্র উহা হইতে তওবা করিয়া উহা বর্জন করেন এবং আল্লার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হন। (৪ পাঃ ৫ রুঃ)

৪৫। হাদীছ :—ওবাদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা (রমজান মাসে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম "লাইলাতুল-কদর" সম্বন্ধে (নির্দিষ্টরূপে উহার তারিখ) জ্ঞাত করাইবার জন্য স্বীয় গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন; পথিমধ্যে দুইজন মোসলমান বিবাদ করিতেছিল। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি "লাইলাতুল-কদর" সম্বন্ধে (উহার নির্দিষ্ট তারিখ ইত্যাদির বিষয় সমূহের অহীপ্রাপ্ত হইয়া) তোমাদিগকে শুনাইবার ও জ্ঞাত করাইবার জন্য আসিয়াছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তিদ্বয় পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়াতে আমার নিকট হইতে সেই অহীর দ্বারা প্রাপ্ত এল্ম

✽ পাপ কার্য্য হইতে প্রত্যাবর্তন করতঃ পুনরায় পাপানুষ্ঠানে বিরত থাকার নাম তওবা। স্বীয় কৃত পাপের জন্য মনে প্রাণে লজ্জিত, অনুতপ্ত ও অনুশোচনাগ্রস্ত হইয়া পুনর্বার কদাপি ঐ পাপানুষ্ঠান না করার কঠিন প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার করতঃ আল্লাহ তায়ালার নিকট সকাতরে ও আন্তরিকভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করাকেই প্রকৃত প্রস্তাবে তওবা বলা হইবে।

উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। (এবং তাহা পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। এই কথা শুনিয়া ছাহাবীগণ অনুতপ্ত হইবেন, তাই) রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—সেই এল্‌ম আমাকে পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই বটে, কিন্তু (লাইলাতুল-ক্বদরের নির্দিষ্ট তারিখ ইত্যাদি) এই শুভ রত্ন ও বরকত হইতে বর্তমানে বঞ্চিত হইতে হইলেও আগামীতে তোমরা সতর্ক হইয়া চলিলে (অর্থাৎ পরস্পর ঐরূপ ঝগড়া বিবাদ ইত্যাদি দ্বারা আল্লার রহমতের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করিলে) আল্লার রহমত প্রাপ্ত হইয়া উন্নতি ও উর্দ্ধগতির উপায় ও পথ পাইতে পারিবে। (এখন নির্দিষ্ট তারিখ হইতে বঞ্চিত হইয়া অলসরূপে বসিয়া না থাকিয়া) সকলে নিরলসভাবে ও সতর্কচিত্তে রমজানের ২৫শে, ২৭শে এবং ২৯শে রাত্রে লাইলাতুল-ক্বদর অন্বেষণ কর। (অর্থাৎ এই রাত্রিগুলিতে এবাদৎ-বন্দেগী করতঃ আল্লার প্রতি রুজু ও ধাবিত হইয়া লাইলাতুল-ক্বদরের ফজিলত হাসিল করায় তৎপর হও। উহার মধ্য হইতেই কোনও একটি রাত্রি লাইলাতুল-ক্বদর হইবে।)

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত ঘটনার দ্বারা একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে—জাতির ভিতরে সংঘর্ষ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সমাজের অভ্যন্তরে ঝগড়া-বিবাদ, আত্মকলহ ও ফের্কা-বন্দী বা দলাদলি আরম্ভ হইয়া গেলে জাতির সীমাহীন উন্নতি ও অন্তহীন উর্দ্ধগতির দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। এমনকি ঐ অবস্থায় নেতৃস্থানীয় নবী বা নায়েবে-নবীগণ পর্য্যন্ত গায়েবী মদদ ও আল্লার এলহামী পৃষ্ঠপোষকতা বা ঐশ্বরিক সাহায্য লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া যান। যেমন আলোচ্য ঘটনায় দুইজন মোসলমানের কলহের দরুন রসুলুল্লার (দঃ) নিকট হইতে অহীপ্রাপ্ত বিশেষ ফলপ্রদ একটি বিষয়ের এল্‌ম ও তত্ত্ব উঠাইয়া নেওয়া হইল। এইরূপে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও স্বীয় কোন অপকর্মের দরুণ নেক আমলের তৌফিক ও উন্নতির পথ বন্ধ হইয়া যায়, অনেক সময় নেক আমল বরবাদও হয়।

আলোচ্য পরিচ্ছেদের মূল বিষয় ইহাই ছিল যে, মোমেনের সর্বদা শঙ্কিত থাকা চাই যে, জীবনের কৃত আমল বিনষ্ট হইয়া যায় না—কি, আল্লার পথে উন্নতির দ্বার আমার জন্য রুদ্ধ হইয়া যায় না—কি। প্রশ্ন হইতে পারে যে, নেক আমল কায়দা-কানুন মতে শুদ্ধরূপের হইলে উহা বিনষ্ট কিরূপে হয়? নেক আমল করিতে থাকিলে উন্নতির দ্বার কেন রুদ্ধ হইবে? এই পরিচ্ছেদের হাদীছদ্বয়ে ইহারই উত্তর রহিয়াছে যে, অনেক গোনাহ আছে যাহার অভিশাপে কৃত নেক আমল বিনষ্ট হয়। যেমন—মোসলমানের পরস্পর লড়াই করা কুফুরী তুল্য বড় গোনাহ; কুফুরী গোনাহের দ্বারা নেক আমল বিনষ্ট হয়। তদ্রূপ নির্দিষ্ট তারিখ জ্ঞাত হইয়া নিশ্চিত লাইলাতুল-ক্বদরের এবাদৎ দ্বারা উন্নতি লাভের পথ পরস্পর বিবাদের দরুন রুদ্ধ হইয়া গেল। এইরূপ অভিশাপময় আরও অনেক গোনাহই আছে, সুতরাং মোমেন বান্দার পথ সর্বদাই কণ্টকাকীর্ণ, তাহার জীবন ভয়সঙ্কুল সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। ইহা হইল ভয়-ভীতির সাধারণ ও স্থূল সূত্র। আর এশ্‌ক ও প্রেম ত নিতান্তই স্বতন্ত্র জিনিস; সে প্রেমাস্পদের ব্যাপারে ভয়-ভীতির জন্য কোন যুক্তি বা কারণ চায় না।

ঈমান, ইসলাম, এহসান ও কেয়ামতের তারিখ সম্পর্কে জিব্রিল ফেরেশতার জিজ্ঞাসায় রসুলুল্লার (দঃ) ব্যাখ্যা দান

নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি "হাদীছে জিব্রিল" নামে পরিচিত। অধিকন্তু হাদীছটিকে "উম্মুছ ছুন্নাহ" (সমস্ত হাদীছের জননী) বলা হইয়া থাকে। নবী (দঃ) দীর্ঘ তেইশ বৎসরের নবী-জীবনে মানব জাতির কল্যাণ ও মুক্তির সন্ধান দানে যাহা কিছু কার্য্যকরীভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন, উহার সার-নির্য্যাস এই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবনের শেষ সময়ে একদা জিব্রিল ফেরেশতা অপরিচিত ব্যক্তির বেশে আসিয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ বিষয় কয়টির মূল্যবান ব্যাখ্যা অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করেন।

বৃক্ষের যেমন প্রাথমিক স্তরে উহার মূল ও শিকড়, দ্বিতীয় স্তরে ডালপালা এবং তৃতীয় স্তরে উহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে—তদ্রূপ ইসলাম ধর্মেরও তিনটি স্তর বা পর্য্যায় রহিয়াছে। প্রথম পর্য্যায়—অন্তরে সন্দেহাতীত অকাট্য বিশ্বাস স্থাপন, ইহা মূল ও শিকড় স্বরূপ। দ্বিতীয় পর্যায়—কাজে ও কথায় ঐ বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্যক্রম ও উহার অনুসরণ, ইহা ডালপালা স্বরূপ। তৃতীয় পর্য্যায়—সীমাহীন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জন, ইহা ফুল ও ফল স্বরূপ। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রসুলুল্লাহ (দঃ) সংক্ষেপে উক্ত তিনটি পর্য্যায়ের ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

৪৬। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِّلنَّاسِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ

مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَلِقَائِهٖ وَتُؤْمِنَ

بِالْبَعْثِ* قَالَ مَا الْاِسْلَامُ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهٖ ✿ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ

وَتُؤَدِّىَ الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ ✝ قَالَ مَا الْاِحْسَانُ قَالَ اَنْ

---

* মোসলেম শরীফে ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত এই ঘটনার হাদীছটির মধ্যে স্থানে স্থানে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লিখিত আছে। অনুবাদের মধ্যে ঐ বিষয়গুলিও অক্ষুন্ন রাখা হইয়াছে। নিম্নে ঐ সকল অতিরিক্ত বাক্যাংশগুলিও উদ্ধৃত হইল।

ঐ হাদীছে এই স্থানে ইহাও উল্লেখ আছে— وتؤمن بالقدر خيره وشره

✿ এখানে মোসলেম শরীফের হাদীছে আছে—

ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله -

✝ মোসলেম শরীফে ইহাও আছে— وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا

تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَاُخْبِرُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّهَا× وَاِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْاِبِلِ الْبُهْمِ فِى الْبُنْيَانِ فِىْ خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْاٰيَةَ ثُمَّ اَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوْهُ عَلَىَّ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِيْنَهُمْ -

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রকাশ্য দরবারে সকলের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। এমন সময় একজন (অপরিচিত) লোক তাঁহার দরবারে আসিলেন এবং (অতি সরলভাবে) জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈমান কাহাকে বলে? [অর্থাৎ ঈমানের হকিকত বা মূল তত্ত্ব কি? +] রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ঈমান [তথা যে বিশ্বাস দ্বারা জীবন-সাধনার প্রারম্ভ হইবে উহা] এই যে—(১) প্রথমতঃ আল্লার অস্তিত্বে ও একত্বে বিশ্বাস করিতে হইবে*। (২) তারপর আল্লার যে সকল বিশেষ বার্তাবহ দূত আছেন, তাঁহাদিগকে ফেরেশতা বলা হয়, সেই ফেরেশতাগণের অস্তিত্বের

× মোসলেম শরীফের হাদীছে ইহাও আছে—

كَانَتِ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُوْسَ النَّاسِ مُلُوْكَ الْاَرْضِ

+ ঈমান শব্দের অর্থ :—এমন অকাট্য আন্তরিক বিশ্বাস যাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় বা শিথিলতার অবকাশও না থাকে। সুতরাং মানব জাতির উন্নতি, শান্তি ও মুক্তি, যে বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল—সেই বিশ্বাস যাহার-তাহার উপর ন্যস্ত করা যায় না। কি কি বিষয়-বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতঃ কর্মজীবন ও ধর্মজীবন গঠন করিলে মানুষের সামগ্রিক জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইবে, তাহাই জিজ্ঞাস্য এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহারই সন্ধান দিয়াছেন।

* ফেরেশতাগণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ও ত্রুটিহীন। তাঁহারা আল্লার আদেশ যখন তখন পালনকারী ও আল্লার আদেশে দুনিয়ার সমুদয় কার্য্য পরিচালনাকারী। তাঁহারা আলোর তৈরী; তাঁহাদের মধ্যে অন্ধকার মোটেও নাই। পাপকার্য্য করার প্রবৃত্তি তাঁহাদের আদৌ নাই এবং তাঁহারা নির্ভুলভাবে আল্লার বাণী তাঁহার আদিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। এই বিষয়গুলির উপরও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে ক। (৩) আল্লার কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে [যে, উহা সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং অবিসংবাদিতরূপে আল্লারই প্রেরিত কিতাব]। (৪) আল্লার পয়গাম্বরগণের উপরও পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিতে হইবে [যে, মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা আল্লার প্রেরিত সত্য নবী। তাঁহারা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, তাঁহাদের মধ্যে কোনরূপ স্বার্থ-প্রেরণার লেশমাত্র ছিল না এবং তাঁহারাই মানব জাতির আদর্শ ও সম্পূর্ণ নির্ভুল আদর্শ]। (৫) তারপর ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে যে—মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হইতে হইবে এবং স্বীয় কৃতকর্মের হিসাব দেওয়ার জন্য ভাল-মন্দ কর্মফল ভোগ করার নিমিত্ত আল্লার দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে ×। (৬) তারপর ইহাও সম্পূর্ণরূপে সমর্থন ও বিশ্বাস করিতে হইবে যে—বিশ্বে প্রতিনিয়ত যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে উহা আমাদের পছন্দনীয় হউক বা অপছন্দনীয় এবং মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে ভাল-মন্দ যাহা কিছু করিয়া থাকে—সবের মধ্যেই সর্বশক্তিমান আল্লার কর্তৃত্ব রহিয়াছে এবং আদিকাল হইতেই আলেমুল গায়েব সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার নিকট পূর্বাহ্নে ঐ সঠিক তালিকাও প্রস্তুত রহিয়াছে*। উল্লিখিত ছয়টি মৌলিক বিষয়ের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করার নাম "ঈমান"। এই ছয়টি বিষয়ের উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক মানুষের কর্ম-জীবন বা জীবন-সাধনা আরম্ভ করিবে]।

ঐ অপরিচিত আগন্তুক (জিব্রিল ফেরেশতা) দ্বিতীয় প্রশ্ন এই করিলেন যে, ইসলাম কি বস্তু? ইসলাম ধর্ম কাহাকে বলে খ? রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তরে বলিলেন, (১) খাঁটিভাবে আল্লাহকে এক বলিয়া যে দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করা হয় সেই বিশ্বাসের প্রকাশ্য শপথ ও স্বীকারোক্তি সর্ব সমক্ষে প্রকাশ পূর্বক এক আল্লার গোলামী অবলম্বন করিতে হইবে।

ক আল্লার একত্বে বিশ্বাস করার অর্থ শুধু এতটুকুই নহে যে আল্লাহ একজন আছেন—মামুলীভাবে ইহা বিশ্বাস করা, বরং আল্লাহই যে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, বিধানকর্তা, বিচারকর্তা এবং আল্লাহ-ই যে অনাদি-অনন্ত, চিরজীবন্ত, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী তাহা বিশ্বাস করা। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ তায়ালা আরও যে সকল মহৎ গুণাবলীর অধিকারী সেই গুণাবলীর সহিত আল্লার অস্তিত্বে ও একত্বে অটল বিশ্বাসী হইলেই প্রকৃত একত্ববাদী গণ্য হইবে।

× হিসাব-নিকাশে যাঁহারা সৎকার্য্য করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে তাঁহারা আল্লার সন্তুষ্টভাজন হইয়া পুরস্কারের স্থান বেহেশতে চিরসুখময় অনন্ত জীবন-যাপন করিবেন এবং যাহারা মন্দ কার্য্য করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে তাহারা দোযখবাসী হইয়া কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে।

* উপরোল্লিখিত ষষ্ঠ বিষয়টির নামই হইতেছে "তকদীর" অর্থাৎ অদৃষ্ট বা নিয়তি। ইহার বিবরণ মূল হাদীছটির পূর্ণ অনুবাদের শেষে "বিশেষ দ্রষ্টব্য" আকারে দেওয়া হইবে।

খ "ইসলাম" শব্দের অর্থ পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে বা যে কোন বস্তুর নিকট আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম নহে। বরং একমাত্র আল্লার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া আল্লার নির্দ্ধারিত বিষয়-বস্তুকে কার্য্যক্ষেত্রে পালন করতঃ ইহ-পরকালের শান্তি ও মুক্তি লাভের পথ ইসলাম। সেই সকল বিষয়বস্তুগুলি কি কি, এখানে তাহাই জিজ্ঞাস্য—রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

শুধু তাহাই নহে, বরং উহার বিপরীত সব কিছুকে বর্জনের ও অস্বীকৃতির স্পষ্ট ঘোষণা দান পূর্বক কার্য্যতঃও শেরেক তথা অংশীদারবাদকে এড়াইয়া চলিতে হইবে। মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার সাচ্চা রসুল বলিয়া অন্তরে যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে ঐ বিশ্বাসেরও তদ্রূপ প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে হইবে। [ইহাই কালেমা শাহাদতের সারমর্ম;] "আশ্‌হাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা-লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু"। অর্থ—আল্লারই বন্দেগী ও দাসত্ব করিব; আল্লার সহিত তাহাকেও শরীক করিব না, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার বিশিষ্ট বান্দা ও রসুল।" [অন্তরের বিশ্বাসের সঙ্গে উহা ব্যবহারিক জীবনে কার্য্যে প্রমাণিত করাও অপরিহার্য্য; তাই] (২) দৈনিক পাঁচটি নির্দ্ধারিত সময়ে, আল্লার দরবারে হাজির হইয়া আল্লার নির্দ্ধারিত আদেশ ও রসুলের নির্দিষ্ট আদর্শ অনুসারে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিতে হইবে। (৩) [স্বীয় অর্থের ও আত্মার পবিত্রতা সাধনের মানসে এবং আল্লার সৃষ্টির সেবার উদ্দেশ্যে আল্লার নির্দ্ধারিত নিয়মানুযায়ী] যাকাত দান করিতে হইবে। (৪) [সংযম অভ্যাস করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপু দমনের জন্য] পূর্ণ রমজান মাসের রোযা রাখিতে হইবে। (৫) [প্রত্যেক মোসলমানের আকাঙ্খা রাখিতে হইবে যে,] সামর্থ্যবান হইলেই হজ্জব্রত পালন করার জন্য আল্লার নির্দ্ধারিত কেন্দ্র—মক্কাস্থিত কা'বা গৃহে পৌছিতে হইবে।

সেই অপরিচিত আগন্তুক (জিব্রিল ফেরেশতা) তৃতীয় প্রশ্ন করিলেন এই যে—"এহসান" কি? [এখানে "এহসান" শব্দের অর্থ—ভালর চাইতে ভালরূপে এবং উত্তমের চাইতেও উত্তমরূপে কর্তব্য কার্য্য সমাধা করা। অর্থাৎ মানুষের জীবন-সাধনায় কৃতকার্য্য হইতে হইলে যেমন তাহাকে ছয়টি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে এবং পাঁচটি সীমাবদ্ধ অনুষ্ঠান নিয়মিত পালন করিয়া যাইতে হইবে, তদ্রূপ তাহার সীমাহীন আত্মার অসীম উন্নতি সাধন করতঃ ভালর চাইতে ভাল এবং তার চাইতে অধিক ভাল হইতে হইলে তাহার পক্ষে কি করা কর্তব্য তাহাই এখানে জিজ্ঞাস্য*। আল্লার রসুল (দঃ) এখানে তাহারই পথ দেখাইতেছেন এবং সে সন্ধানই দিতেছেন।] রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তরে বলিলেন—"এহসান" তথা সেই অসীম উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে হইলে, তোমাকে আল্লার গোলামী করিয়া চলায় আজীবন সাধনা করিয়া যাইতে হইবে, আর সেই সাধনা হইবে এইরূপ একনিষ্ঠ সাধনা যেন তুমি স্বয়ং খোদা তায়ালাকে দেখিতেছ। কেননা, যদিও তুমি খোদাকে দেখিতেছ না, কিন্তু খোদা ত তোমাকে দেখিতেছেন।

---

* "মানুষ" শুধু রক্ত মাংশ ও অস্থিমজ্জায় গঠিত জড়পিণ্ডের নাম নহে, বরং অসীম আত্মা ও সসীম দেহ এই দুই-এর প্রকৃত সমন্বয় সাধনের নাম মানুষ। মানুষের স্থূল দেহ ফুলিয়া ফাঁপিয়া মেদবহুল ও মোটা হইলে বা ৫।৭ গজ লম্বা হইলেই তাহাতে মানুষের উন্নতি লাভ হয় না। মানুষের উন্নতি হয় তাহার অসীম আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বারা। সেই উন্নতির উপায় ও পথকেই এখানে "এহসান" নামে ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) উহারই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

[তাই তোমাকে বিরামহীনরূপে সেই একনিষ্ঠ সাধনা করিয়া যাইতে হইবে। মনিবের সম্মুখে অন্ধ ভৃত্য—যদিও সে মনিবকে দেখিতে পায় না তবুও মনিবকে দেখা অবস্থার ন্যায়, বরং অধিক একাগ্রতার সহিত বিরামহীন সাধনা করিয়া চলে; কারণ সে জানে যে, মনিব তাহাকে দেখিতেছেন—যাহা বিরামহীনরূপে ঐকান্তিক সাধনায় ব্রতী থাকার মূল কারণ। মানবের অবস্থা আল্লার সম্মুখে তদপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল নয় কি? অতএব তাহার সাধনা বিরতি ও শৈথিল্য বিহীন হইবে না কেন?

এই সাধনা কেবলমাত্র নামায বা মসজিদেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না; এই সাধনার সুবিস্তৃত ক্ষেত্র এবং তাৎপর্য্য হইবে এই যে—নামায, রোযা ইত্যাদি নেক আমল সমূহে, তদুপরি হাটে-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে, ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে, কথা-বার্তায়, বক্তৃতায় এবং লেখনী বা মস্তিষ্ক চালনায় ও চিন্তাধারায় অর্থাৎ মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি পর্য্যায়ে, প্রতিটি স্তরে ও প্রত্যেক পদক্ষেপে এমনকি উঠা-বসা, চলা-ফেরা পানাহার ইত্যাদি যাবতীয় দৈনন্দিন সাংসারিক ও বৈষয়িক কার্য্যসমূহে এরূপভাবে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে এবং এমনভাবে কর্মজীবন যাপন ও চরিত্র গঠন করিতে হইবে যাহাতে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, তুমি একটা উচ্ছৃঙ্খল, উদ্ভট, স্বেচ্ছাচারী দানব-বিশেষ নহ। বরং তুমি আল্লার অনুগত আল্লার গুণে গুণান্বিত আল্লারই একজন দাস, এমন দাস যে স্বীয় মনিবকে সম্মুখে চাক্ষুষ দেখিতেছ। বলা বাহুল্য—কোন ভৃত্য বা কৃতদাস যখন কর্তব্যরত অবস্থায় স্বীয় মনিব ও মাওলাকে স্বচক্ষে দেখিতে পায়, তখন তাহার অন্তরে কতই না ভয় ও ভক্তির ভাব জাগ্রত থাকে এবং সেই ভয় ও ভক্তির আড়ালে একাগ্রচিত্তে ও সুষ্ঠুরূপে কার্য্য সমাধা করার কিরূপ আপ্রাণ চেষ্টাই না সে করিয়া থাকে; মানব তাহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এই প্রকার ঐকান্তিক চেষ্টা ও নিরবিচ্ছিন্ন সাধনার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিবে, ইহারই নাম "এহসান"+।]

ঐ আগন্তুক চতুর্থ প্রশ্ন এই করিলেন যে, কেয়ামত বা মহাপ্রলয় কবে আসিবে এবং উহার নির্দিষ্ট দিন-তারিখ কবে? (অর্থাৎ—মানুষ যে সকল কর্তব্যাকর্তব্য পালন করিবে ও

+ সাধারণতঃ এই হাদীছের অর্থে যদিও নামাযের মধ্যে এহসানের মর্তবা তথা উপরে বর্ণিত অবস্থা হাসিলের কথা বলা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল তাহাই নহে, বরং মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পদক্ষেপে উপরোক্ত অবস্থা সৃষ্টি করার নাম "এহসান"। আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত الله تعبد শব্দের অর্থ নিজেকে আল্লার দাসরূপে রূপায়িত করিয়া তদনুযায়ী সামগ্রিক জীবনকে সুগঠিত ও পরিচালিত করা। মোসলেম শরীফের রেওয়ায়েতে এই মর্মই ব্যক্ত হইয়াছে—ان تخشى الله كانك تراه। অর্থাৎ সর্বদা তোমার অন্তরে আল্লার ভয়-ভক্তি এরূপ জাগ্রত রাখ, যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ। (পরন্তু,যদিও তাঁহাকে দেখিতেছ না, কিন্তু তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখিতেছেন)।

উল্লিখিত এহসানের পর্য্যায়ে পৌছার পথকে সহজ করার জন্যই "তাছাওফ" বা তরীকতের আবিষ্কার হইয়াছে। এই পর্য্যায় হাসিল করাই মানব জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য।

কঠোর সাধনা করিয়া কর্মজীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য চেষ্টারত থাকিবে, উহার ফলাফল নিশ্চয় একদিন প্রকাশিত হইবে এবং সেই দিন ও সময়টি কখন আসিবে তাহা নির্দিষ্ট ও নির্দ্ধারিতরূপে বলিয়া দিন।)

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে আমি আপনার চাইতে অধিক কিছু জানি না। কেননা কেয়ামত বা ইহজগতের প্রলয়ের নির্দিষ্ট তারিখ সম্বন্ধে আপনি যেমন অজ্ঞ আমিও তদ্রূপই অজ্ঞ। অবশ্য ঐ সময় বা মহাপ্রলয়ের দিনটি নিকটবর্তী হওয়ার আলামত বা নিদর্শন আমি আপনাকে বলিয়া দিতেছি।

যখন সন্তান-সন্ততিগণ মাতা-পিতার ঔরষজাত হওয়া সত্ত্বেও উহারা তাহাদের অবাধ্য তাহাদের নাফরমান, তাহাদের প্রতি চাকর-চাকরানীর ন্যায় ব্যবহারকারী হইবে এবং যখন চরিত্রহীন ও অতিশয় নিম্নস্তরের ইতর প্রকৃতির রাখাল মজুর শ্রেণীর লোকদের হাতে কর্তৃত্ব ও রাজ্য শাসনের ভার চলিয়া যাইবে এবং ধন-দৌলত অর্থ-সামর্থ্যও ঐ শ্রেণীর লোকদের হাতেই চলিয়া যাইবে এবং তাহারা ঐ অর্থের সদ্ব্যবহার না করিয়া প্রতিযোগিতা-মূলক ভাবে বড় বড় মহল—অট্টালিকাদি তৈয়ার করিবে এবং উহাতেই গৌরব বোধ করিবে। এই সবই হইবে কেয়ামত তথা জগৎ ধ্বংসের পূর্ববর্তী আলামত। (অর্থাৎ কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের নিকটবর্তী জগতে ব্যাপক পরিবর্তন ও ওলট-পালট দেখা দিবে। ছেলে-মেয়েরা মুরব্বীদের সঙ্গে এমনকি জননী মাতার সহিত মেয়ে পর্য্যন্ত এরূপ অবাধ্যতার পরিচয় দিবে যেন ছোটরাই মুরব্বী। চরিত্রহীন ইতর প্রকৃতির লোকেরাই তখন প্রবল হইয়া উঠিবে এবং সৎলোকের অস্তিত্ব লোপ পাইতে থাকিবে। মূল প্রশ্ন কেয়ামত কবে আসিবে, উহার নির্দিষ্ট তারিখ কেহই বলিতে পারে না। কারণ,) ইহা ঐ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে একটি যাহা আল্লাহ ভিন্ন আর কেহই জানে না। এই শেষ প্রশ্নের সমর্থনে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই আয়াতটি পাঠ করিলেন— ❁ ان الله عنده علم الساعة

❁ রসুলুল্লাহ (দঃ)কে কাফেররা পাঁচটি প্রশ্ন করিয়াছিল, উহারই উত্তরে এই আয়াত নাযেল হয়। আয়াতের অর্থ:—(১) কেয়ামত বা মহাপ্রলয় অনুষ্ঠিত হওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন এবং (২) তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া থাকেন; (তাই কখন কোথায় কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইবে এসব বিষয়ের বিস্তারিত তত্ত্ব সঠিকরূপে ও সরাসরি ভাবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই অবগত আছেন। মানুষ এই বিষয়ে যতটুকু জানিতে পারে উহা শুধু আবহাওয়া সংক্রান্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঋতু পরিবর্তনজনিত প্রতিক্রিয়া দৃষ্টে বা যান্ত্রিক সাহায্যে সম্ভাব্যমূলক নিদর্শনাদি অনুভব করিয়া কেবল আনুমানিক ধারণা জন্মায় মাত্র; উহা কখনই সুনিশ্চিত বা সরাসরি অবগত হওয়া নহে)। (৩) মাতৃগর্ভে অবস্থিত সন্তান—ছেলে, কি মেয়ে তাহাও সঠিক-ভাবে এবং নির্দিষ্টরূপে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। (৪) ভবিষ্যতে কে কি করিবে এবং (৫) কোথায় কাহার মৃত্যু হইবে, তাহাও একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সঠিক অভ্রান্তরূপে অবগত আছেন। (বস্তুত কেবলমাত্র এই পাঁচটি বিষয়েরই নহে, বরং পৃথিবী ও আকাশের সমুদয় বিষয়ের সুনির্দৃষ্ট গায়েবী-এল্‌ম বা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ তায়ালা; নিশ্চয় তিনি অন্তর্য্যামী, সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী। (২১ পারা, ছুরা লোকমান, শেষ রুকু

এই পর্য্যন্ত প্রশ্নোত্তরের পর ঐ আগন্তুক চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে আদেশ করিলেন—তাঁহাকে আমার নিকট ফিরাইয়া আন। কিন্তু আগন্তুক মুহূর্তে কোথায় চলিয়া গেলেন, ছাহাবীগণ তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—ঐ আগন্তুক জিব্রিল ফেরেশতা ছিলেন। (প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়া) তোমাদিগকে দ্বীন ও ধর্মের প্রধান বিষয়সমূহ জ্ঞাত করাইবার জন্য আসিয়াছিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—("তকদরী কি? উহার তাৎপর্য্য ও বিবরণ—)

জাগতিক কার্য্যক্রম ও ঘটনা-প্রবাহ সাধারণতঃ দুই প্রকার। প্রথম প্রকার যাহা মানুষের কোনরূপ হস্তক্ষেপ বা ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যতিরেকে স্বভাবতঃই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে—যাহাকে প্রাকৃতিক ঘটনা বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার যাহা মানুষের দ্বারা এবং তাহারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে—যাহাকে মানবিক কার্য্যক্রম বা মানুষের দ্বারা সম্পাদিত কার্য্য বলিয়া গণ্য করা হয়।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত উভয় প্রকারের সমস্ত বিষয় ও ঘটনাসমূহ যত বড় বা যত ছোটই হউক না কেন, প্রতিটি কার্য্য ও ঘটনার মধ্যেই (১) সর্বশক্তিমান আল্লার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব রহিয়াছে। তদুপরি আল্লাহ যেহেতু সর্বজ্ঞ, আলেমুলগায়েব; তাই (২) অনন্তকাল ব্যাপিয়া যে কোন প্রকারের যাহা কিছু ঘটিবে, বা যাহার দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইবে, অনাদিকাল হইতেই আল্লাহ তায়ালা সে সব জানেন। এমনকি আল্লার সেই অভ্রান্ত জ্ঞান অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট টাইম-টেবল (Time table—রেল কোম্পানীর সময় নির্দ্ধারক তালিকা)-এর ন্যায় পূর্ব হইতেই সব কিছুর পূর্ণ তালিকা পর্য্যন্ত তিনি প্রস্তুত রাখিয়াছেন। (৩) যেহেতু আল্লার এল্‌ম (জ্ঞান) ও জানা কখনই ভ্রমাত্মক বা অপ্রকৃত—অবাস্তব হইতে পারে না, সুতরাং ঐ তালিকার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হওয়া কদাপি সম্ভব নহে। উপরোল্লিখিত তিনটি বিষয়ের সমষ্টির নামই হইয়াছে "তকদীর" অর্থাৎ অদৃষ্ট বা নিয়তি।

এই বর্ণনায় স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে—"তকদীর" বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহা বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালার দুইটি ছেফৎ বা গুণেরই বিশেষ অনুচ্ছেদ মাত্র। উহার একটি হইতেছে "কুদরত" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সর্বশক্তিমান হওয়া। আর দ্বিতীয়টি হইতেছে "এল্‌ম" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার অনাদিকাল হইতেই সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী হওয়া।

জাগতিক ঘটনা প্রবাহের প্রথম প্রকারের ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে তকদীরের বিষয়ে বিশেষ কোনও দ্বিধা বা সংশয়ের উদয় ছিল না। এমনকি এই প্রকারের কোনও ঘটনা কোনরূপ বাহ্যিক কারণ ও হেতুর আবরণে পরিবেষ্টিত থাকিলেও, যেহেতু কার্য্য কারণ পরম্পরায় শেষ পর্য্যন্ত ঐ কারণের কারণ তস্য কারণ হাতড়াইয়া পাওয়া যায় না কিম্বা নিজেদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা উহার রহস্যজাল ভেদ করিতে অসমর্থ হয়, তাই বাধ্য হইয়া সেখানে তকদীরকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং নিজেদের পরিভাষায় উহাকে "প্রাকৃতিক" বলিয়া অভিহিত করা হয়।

আর দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ মানুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্য্যক্রম সম্বন্ধে তক্দীরের বিষয়ে নানা প্রকার সংশয়ের উদয় হইয়া থাকে। তাই এখানে একটি বিষয় বিশেষরূপে লক্ষণীয় যে—আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সম্পূর্ণ অক্ষম নির্জীব জড়পদার্থরূপেও সৃষ্টি করেন নাই, কিম্বা স্বয়ং-সম্পূর্ণ, সক্ষম, সর্বশক্তিমান করিয়াও সৃষ্টি করেন নাই। বরং আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নেহাৎ স্বাভাবিক, সীমাবদ্ধ ও পরিমিত জ্ঞানশক্তি দান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও, ঐ সকল প্রদত্ত শক্তিসমূহকে আল্লাহ তায়ালা একান্তই স্বীয় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার কর্তৃত্বের বিধানে ইহাও বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যে—মানুষ তাহার শক্তিসমূহ কোন ভাল বা মন্দ পথে পরিচালিত করিলে উহাতে আল্লার তরফ হইতে কোনরূপ প্রত্যক্ষ বাধা সৃষ্টি করার কোনও বাধ্যবাধকতা মোটেই থাকিবে না। অন্যথায় কর্ম জগতের মূল রহস্য—"পরীক্ষা" অনুষ্ঠিত হইতে পারে না।

মানবকে উল্লিখিত শ্রেণীর শক্তিতে শক্তিমান করিয়া, ভাল-মন্দ চিনিবার জন্য শরীয়তকে মাপ-কাঠিরূপে প্রদান করতঃ আল্লাহ তায়ালা তাহাকে (মানবকে) কর্মক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন; لينظر كيف تعملون "পরীক্ষার দ্বারা প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য যে—হে মানব; তোমরা কোন্ পথ অবলম্বন কর।" এখন চিন্তা করিয়া দেখুন যে, মানুষ নিশ্চিতরূপে স্বীয় কর্মফল ভোগ করিবে না কেন? নিশ্চয় ভোগ করিবে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা মানবকে যে ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতাটুকু দান করিয়াছেন—যদ্দ্বারা মানব জাতি অপরাপর অক্ষম নির্জীব জড়পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন পরিগণিত হয়; ঐ শক্তি ও ক্ষমতাকে সৎ বা অসৎ—ভাল বা মন্দ পথে পরিচালিত করার জন্য মানবই দায়ী। এতদ্দৃষ্টে তক্দীরের উপর বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা কর্মক্ষেত্রে কোনও বাধার সৃষ্টি হইতে পারে কি?

তক্দীর বলিতে আল্লার যে অসীম কর্তৃত্ব, প্রাধান্য ও শক্তিমত্তা বুঝায়, উহার উপর বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা বহু সুফল প্রতিফলিত হইতে পারে। যথা—(১) কর্মক্ষেত্রে মানুষ নিজকে বাহ্যতঃ যৎকিঞ্চিৎ ক্ষমতাবান দেখিতে পাইলেও সে নিজকে স্বয়ং সম্পূর্ণ তথা অবিমিশ্র শক্তির অধিকারী বলিয়া ধারণা করিবে না। যেরূপভাবে ফেরাউন-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ নিজেদের সম্পর্কে ঐ প্রকার ধারণা পোষণ করতঃ উহা কার্য্যে পরিণত করিতে যাইয়া বহু অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে। (২) আল্লাহ তায়ালা যে, মহান ও সর্বশক্তিমান তাহা সর্বদা মনে জাগ্রত থাকিবে এবং নিজকে সর্বদাই তাঁহার মুখাপেক্ষী, সাহায্য-প্রার্থী ও দয়ার ভিখারীরূপে গণ্য করিয়া জীবনের সকল কার্য্য পরিচালিত করিবে। (৩) কোনও কার্য্যে শত চেষ্টার পরেও অকৃতকার্য্য বা বিফল হইলে তাহাতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া একেবারে মনে ভাঙ্গিয়া ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িবে না, বরং স্বীয় মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দান করিবে যে—সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতেই এরূপ হইয়াছে এবং নিশ্চিতই ইহার অন্তরালে হয়ত আল্লাহ তায়ালার এমন কোনও সুফল প্রসূ ইঙ্গিত অথবা

মঙ্গল-সূচক ইচ্ছা নিহিত রহিয়াছে, যদ্দরুন ইহাই আমার জন্য তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। তাই ইহাতে আমাদের কিছুই করিবার নাই; আমরা ত তাঁহার গোলাম মাত্র। অতএব, মনিবের যাহা ইচ্ছা গোলামের প্রতি করিতে পারেন। মনের মধ্যে এই প্রকার ভাব জাগ্রত করিয়া ধৈর্য্য ধারণ পূর্বক উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। (৪) কোনও বিষয়ে বাহ্যতঃ স্বীয় চেষ্টা ও শক্তির দ্বারা কৃতকার্য্য ও সফলকাম হইলেও, তজ্জন্য ঐ ব্যক্তি ফেরাউন প্রকৃতির হইবে না, বরং মনে মনে আল্লার নিকট কৃতজ্ঞ ও শোকরগোজার হইবে এই ভাবিয়া যে, আল্লাহ তায়ালাই তাঁহার অপার করুণা-বলে আমাকে এই সাফল্য লাভের তৌফিক ও সুযোগ দান করিয়াছেন; ফলে তাহার স্বভাবে নম্রতা আসিবে; উগ্রতা ও ঔদ্ধত্য সৃষ্টি হইবে না, আল্লার বান্দাদের প্রতি সে বিনয়ী ও সদয় হইবে।

এসবই হইতেছে তকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপনের অনিবার্য্য ও বাস্তব প্রতিক্রিয়ার সুফল। ইহার পরিবর্তে কেহ যদি তকদীরের নামে স্বীয় কর্মজীবনে দুর্বলতা টানিয়া আনে, অর্থাৎ অকর্মণ্য, নিরুৎসাহ ও উদ্যমহীন হইয়া পড়ে তবে তাহা ঐ ব্যক্তির নিজের ত্রুটি ও শয়তানের ধোকা ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

তকদীরের যে সংজ্ঞা ও তাৎপর্য্য বর্ণিত হইল এবং তকদীরের উপর ঈমান স্থাপনের যে ফলাফল ব্যক্ত হইল—এই সব তথ্যের প্রতি পবিত্র কোরআনেই সংক্ষেপে ইশারা রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ - لِكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ - وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ -

অর্থ:- ভূপৃষ্ঠে যে কোন বিপদ-আপদ, দুর্যোগ-দুর্ভোগের আগমন হয় এবং উহার যে কোন্‌টা কোন মানুষের উপর আসে উহার প্রত্যেকটাই কিতাবে তথা লৌহে-মাহ্‌ফুজে লিখিত আছে—উক্ত বিপদ ও দুর্যোগকে আমি সৃষ্টি করার পূর্বেই, বরং ঐ মানুষটিকে সৃষ্টি করার পূর্বেই। (তদ্রূপই জগতে যখন যে সুযোগ-সুদিন, সুখ-সমৃদ্ধির সঞ্চার হয় এবং উহা যে কাহারও জীবনে সমাগত হয় উহারও প্রত্যেকটাই কিতাবে লিখিত আছে—উহাকে সৃষ্টি করিবার পূর্বেই।) এইরূপে লিখিয়া রাখা (আমি) আল্লার পক্ষে নিতান্তই সহজ ব্যাপার। এই তথ্যটা তোমাদিগকে জ্ঞাত করান হইল শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা কেহ কোন মনোবাঞ্ছা হইতে বঞ্চিত বা উহা লাভে ব্যর্থ হইলে কিম্বা কোন ধন-জনহারা হইলে সে যেন ক্ষোভ-বিহ্বল বা শোক-বিহ্বল হইয়া না পড়ে। (ধৈর্য্যধারণ

করিয়া মনোবল অক্ষুন্ন রাখে) এবং কেহ আল্লার তরফ হইতে ভাল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সে যেন ঔদ্ধত্যে, দম্ভে ও খুশিতে উন্মত্ত না হয়; (শুকুরগোজার—আল্লার নিকট কৃতজ্ঞ ও বান্দাদের প্রতি বিনয়ী হয়।) কোন অহঙ্কারী দাম্ভিককে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। (২৭ পারা ১১ রুকু)

তকদীরের উপর ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে অপরিহার্য্য, তাহা মোসলেম শরীফের একটি হাদীছ দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণিত। হাদীছটি এই:—

এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিল, আমাদের দেশে নূতন মতবাদের একদল লোক আবির্ভূত হইয়াছে। তাহারা একদিকে বেশ কোরআন শরীফ পাঠ করিয়া থাকে এবং জ্ঞান-চর্চা তথা ধর্মীয় গবেষণাদিও করিয়া থাকে, কিন্তু অন্যদিকে তাহারা তকদীরের প্রতি বিশ্বাসী নহে, বরং তাহারা তকদীরকে অস্বীকার করিয়া থাকে। এতচ্ছ্রবণে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহাদিগকে বলিয়া দিও যে, আমাদের তথা খাঁটী মোসলেম জাতির সহিত তাহাদের কোনই সংশ্রব নাই; তাহারা মোসলেম জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন। আমি মহান আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহারা যত প্রকার ও যত বড় নেক আমলই করুক না কেন, এমনকি পাহাড় সমতুল্য স্বর্ণও যদি তাহারা আল্লার রাস্তায় দান-খয়রাত করে, তথাপি উহা আল্লার দরবারে কবুল হইবে না; তাহারা উহার কোন ছওয়াবই পাইবে না যাবৎ না তাহারা উক্ত ইসলাম বিরোধী ধারণা ও মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া তকদীরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমান স্থাপন করে।×

পাঠকবর্গ! এখানে তকদীরের যে ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে সেই অনুযায়ী ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের এই উক্তি অত্যন্ত সঙ্গত। তকদীরকে অস্বীকার করা প্রকারান্তরে আল্লাহ তায়ালার দুইটি বিশেষ ছেফৎ ও গুণকে বা উহার ব্যাপকতাকে অস্বীকার

× আরও এক হাদীছে আছে, হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—কোন ব্যক্তি মোমেন বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না যাবৎ না সে (নিম্নে বর্ণিত) চারিটি বিষয়ের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। (১) আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই। (২) আমি (আল্লার রসুল;) সত্য ও খাঁটী দ্বীন প্রচারের জন্য প্রেরিত হইয়াছি। (৩) মৃত্যু অনিবার্য্য এবং তৎপর হিসাব দিবার জন্য পুনরুজ্জীবিত হইতে হইবে। (৪) তকদীর বরহক্ (তিরমিজী শরীফ)

এই সব হাদীছ দৃষ্টে প্রত্যেক নাজাতকামী মোসলমানের লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যে, "বুঝ ও যুক্তিতে আসে না" ইত্যাদি কোন অজুহাতে তকদীরকে অস্বীকার করা নাজাতের পরিপন্থী হইবে। কেহ আবশ্যক মনে করিলে যুক্তি-যুক্তরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারে, আজীবন সেই চেষ্টা চালাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু অজুহাত দেখাইয়া উহাকে এনকার করার কোনই অবকাশ নাই। অবশ্য তকদীরের কোন ভুল ব্যাখ্যা মনে গাঁথিয়া লইয়া কর্মজীবনে হাত-পা গুটাইয়া নিরুৎসাহ, নিষ্কর্মা হইয়া বা চেষ্টা ও তদবীরবিহীন হইয়া বসিয়া থাকাও সমর্থনীয় নয়। অনেক ক্ষেত্রে তকদীরের ভুল ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাকের প্রতি নানাপ্রকার দোষারোপ করিতেও শুনা যায়, উহার পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ।

করা। কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে, তবদীর বলিতে যাহা কিছু বুঝায় বস্তুতঃ উহা আল্লাহ তায়ালার দুইটি ছেফৎ বা গুণেরই বিশেষ অনুচ্ছেদ মাত্র। বলা বাহুল্য, যে কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার কোনও একটি ছেফৎ বা গুণকে অস্বীকার করিলে ঈমান ও ইসলাম বহাল থাকিতে পারে না।

সন্দেহজনক কাজ হইতে সংযমী হওয়ার ফজিলত ও সুফল

৪৭। হাদীছ ঃ—عن النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم—

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اِسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهٖ وَعِرْضِهٖ وَمَنْ وَقَعَ فِى الْمُشْتَبِهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يُّوَاقِعَهٗ اَلَا وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اَلَا اِنَّ حِمَى اللّٰهِ فِىْ اَرْضِهٖ مَحَارِمُهٗ اَلَا وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ ✣

অর্থ ঃ—নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে—"হালাল" ষ্টস্প এবং "হারাম" স্পষ্ট। আর এই দুইটির মধ্যস্থলে কতগুলি "সন্দেহ জনক" শ্রেণীর বিষয়বস্তুও রহিয়াছে। ঐগুলি কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত তাহা অধিকাংশ লোকেরাই নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ঐ সন্দেহজনক বিষয়গুলি হইতে সংযমী হইবে (ঐগুলিকে সযত্নে পরিহার করিয়া চলিবে) একমাত্র তাহারই দ্বীন ঈমান ও আবরু-ইজ্জত সুরক্ষিত ও কলুষমুক্ত থাকিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়বস্তু সমূহে লিপ্ত হইবে, তাহার অবস্থা এরূপ—যেমন কোন রাখাল তাহার পশুপালকে (সরকারী বা কাহারও) সংরক্ষিত স্থান (Protected area) এর নিকটবর্তী চরাইয়া থাকে; তদবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার পশুগুলি ঐ সংরক্ষিত এলাকায় ঢুকিয়া পড়িবে (এবং তদ্দরুন রাখাল বিপদগ্রস্ত হইবে। তদ্রূপ মধ্যস্থলীয় সন্দেহ-জনক বিষয়বস্তুগুলি হইতে যে ব্যক্তি সংযমী না হইবে এবং উহা হইতে দুরে না থাকিবে,

---

✣ এই হাদীছটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হাদীছ। মানুষ কি উপায়ে স্বীয় দ্বীন ও ধর্মজীবনকে রক্ষা ও হেফাজত করিতে এবং মানবতার উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধন করিতে পারে তাহারই উপায় এই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। তাছাড়া এই হাদীছটির আরও অন্যান্য অনেক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তাই প্রথমতঃ সরল অনুবাদ তৎপর ব্যাখ্যা এবং তারপর "বিশেষ দ্রষ্টব্য" আকারে ইহার একটি সুক্ষ্ম তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হইবে।

অচিরেই অনিবার্যরূপে তাহার নফ্‌ছ বা প্রবৃত্তি স্পষ্ট হারামে লিপ্ত হইয়া পড়িবে, ফলে সে দুনিয়া ও আখেরাতে অপদস্থ হইবে)। তোমরা শুনিয়া রাখ, প্রত্যেক বাদশারই সংরক্ষিত এলাকা থাকে (যেখানে অন্য সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে)। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ বিষয়বস্তু সমূহই দুনিয়ার বুকে তাঁহার সংরক্ষিত স্থান তুল্য; (সেখানে কাহারও প্রবেশ করিতে নাই, অধিকন্তু উহার নিকটবর্তী হওয়া তথা সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হওয়াও উচিত নহে।

সন্দেহজনক বিষয়-বস্তু হইতে স্বীয় দ্বীন-ধর্ম ও আবরু-ইজ্জতকে কলুষমুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত রাখিতে এবং মানবতার উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হইতে সহজে সক্ষম হওয়ার জন্য) আরও শুনিয়া রাখ, মানুষের অজুদের ভিতরে অর্থাৎ মানব দেহের মধ্যে এমন একটি অংশ আছে যে, সেই অংশটি যখন যথার্থরূপে ঠিক হইয়া যায়, তখন মানুষের পুর্ণ অজুদই ঠিক হইয়া যায়। (অর্থাৎ সম্পুর্ণ মানব দেহটিই তখন সঠিক-ভাবে পরিচালিত হইতে থাকে।) পক্ষান্তরে সেই অংশটি যখন খারাপ হইয়া পড়ে, তখন সমস্ত অজুদটিই খারাপ হইয়া যায় (অর্থাৎ মানব দেহের কোন অংশ বা কোন অঙ্গই তখন সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না)। বিশেষভাবে জানিয়া রাখা উচিত যে, সেই অংশটি হইতেছে আ'কল বা বিবেক।*

ব্যাখ্যা ঃ—শরীয়তের যাবতীয় হুকুম-আহকাম (আদেশ-নিষেধাবলী) চারি প্রকার দলীল দ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে। কোরআন, হাদীছ, এজমা ও কেয়াছ। উহার যে কোনও একটি দ্বারা যে কোন বিষয় সুনির্দিষ্টরূপে "হালাল" বৈধ ও গ্রহণীয় বলিয়া প্রমাণিত হইবে উহাই হালাল এবং যে কোন বিষয় সুস্পষ্টরূপে "হারাম" নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বলিয়া প্রমাণিত হইবে উহাই হারাম। এতদৃষ্টে হালাল ও হারাম অতি স্পষ্ট বস্তু এবং ঐ সকল দলীল, প্রমাণ ও মাপকাঠি দ্বারা উভয়কে বাছিয়া লওয়া অত্যন্ত সহজ। অধিকন্তু ইহাও স্পষ্ট যে, হালালকে গ্রহণ করা যাইবে এবং হারামকে বর্জন করিতে হইবে—ইহাতে কোন প্রকার মতদ্বৈধতা বা কোন প্রকার দুর্বলতা বশতঃ এদিক সেদিক বিন্দুমাত্রও নড়চড় করিবার অবকাশ নাই। কিন্তু হালাল ও হারাম পর্য্যায়দ্বয়ের মধ্যবর্তী আরও কতিপয় বিভিন্ন পর্য্যায় রহিয়াছে। যথা—(১) মকরূহ, (২) খেলাফে-আওলা বা অবাঞ্ছনীয়, (৩) ইমাম ও খাঁটী ওলামাদের মতবিরোধমূলক বিষয়াদি। এতদ্ব্যতীত এমন আরও বহু বিষয়াদি আছে যাহা শরীয়তে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং তাহা ছাড়াও দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের ভিতর দিয়া প্রায়শই এরূপ বিষয়াদি আমাদের সম্মুখবর্তী হইতে থাকে যাহা নির্দিষ্টভাবে হালাল বলিয়াও নিশ্চিত হওয়া যায় না, কিম্বা হারাম বলিয়াও স্থির করা যায় না—এই সকল অনিশ্চিত

* قلب "কলব" শব্দের প্রকৃত অর্থ দেল বা হৃদয়। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হইল উহার মধ্যে নিহিত আ'কল বা বিবেক, এমনকি কেহ কেহ বলেন যে, এস্থলে কলব শব্দটি সরাসরি আ'কল বা বিবেক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। (ফতহুলবারী)

ও সন্দেহমূলক বিষয়গুলিকে সযত্নে পরিহার করিয়া চলাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা, এই সমস্ত সন্দেহজনক বিষয়-বস্তু সমূহ হইতে বিরত থাকিলে এক দিকে জাগতিক ব্যাপারে যেমন লাভবান হওয়া যায়, কারণ সন্দেহের স্থানে পা রাখিলেই স্বীয় মান-মর্য্যাদা কলুষিত হওয়ার এবং নানা প্রকার কুৎসা রটিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। অন্য দিকে তেমনি দ্বীনের ব্যাপারেও লাভের সীমাই থাকে না, কারণ যে ব্যক্তি স্বীয় নফ্‌ছ ও প্রবৃত্তিকে সন্দেহের স্থান হইতে বিরত রাখিতে অভ্যস্ত হইবে সে নিশ্চয়ই যাবতীয় কুপ্রলোভনের বস্তু হইতে, যাবতীয় কুকর্ম হইতে এবং যাবতীয় হারাম কার্য্য হইতে স্বীয় নফছকে ফিরাইয়া রাখিতে সক্ষম হইবে।

হারাম ও সন্দেহজনক কার্য্যাবলী হইতে বাঁচিতে চাহিলে সর্বপ্রথম স্বীয় আকল ও বিবেককে যথার্থরূপে সুষ্ঠু ও ঠিক করিতে হইবে। কারণ, মানুষের বিবেকই মানবদেহরূপী কারখানার জন্য বৈদ্যুতিক মোটর (Electric motor) স্বরূপ। মোটর ঠিকভাবে চালু থাকিলে কারখানার প্রতিটি শাখা, উহার প্রত্যেকটি অংশ ও সমস্ত কল-কব্জার চাকাগুলিই রীতিমত চলিতে থাকিবে। আর মোটরে গোলযোগ থাকিলে উহার সহিত সংযোগ রক্ষাকারী সমস্ত মেশিন ও উহার অংশগুলির মধ্যেও গোলযোগ দেখা দিবে। অবশ্য মোটরের সহিত চাকাগুলির সক্রিয় সংযোগ রক্ষার প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নতুবা মেশিনের বিভিন্ন অংশের সহিত সংযোগ বিহীন শুধু মোটর চালাইয়া বসিয়া থাকিলে উদ্দেশ্য সফল হইবে না এবং ঐ প্রকার নিরর্থক ও অনিয়মিত পরিচালনার ফলে কারখানা ফেল (Fail) হইয়া যাইবে। অতএব মেশিনের সমস্ত কলকব্জা ও উহার বিভিন্ন অংশগুলিকেও রীতিমত চালু রাখিয়া মোটরের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কারণ উহার ভাল-মন্দের প্রভাব সমস্ত কারখানার উপর পড়িয়া থাকে। তদ্রূপ মানবের কর্তব্য তাহার বিবেক-বুদ্ধিকে সুষ্ঠু করিয়া তারপর সেই সুষ্ঠু জ্ঞান-বিবেকের দ্বারা স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পরিচালিত করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আলোচ্য হাদীছটিকে হাদীছে-তাওকয়া, হাদীছে-হালাল-হারাম, হাদীছে এছ্‌লাহে-কাল্‌ব বা আধ্যাত্মিক শুদ্ধি লাভের হাদীছ বলা হয়। নবী (দঃ)-এর হাদীছ সমূহের মধ্যে চারিটি হাদীছ এমন আছে যাহাকে সমস্ত শরীয়ত ও তরীকত তাছাওফের মূল উৎস বলা যাইতে পারে। হাদীছগুলি এই :—

১ম—নিয়তের হাদীছ (সর্বপ্রথমে—১ নম্বরে যে হাদীছটির অনুবাদ হইয়াছে))

২য়—دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَا يُرِيْبُكَ "সন্দেহজনক বিষয় ত্যাগ করিয়া নিঃসন্দেহ বিয়য়কে অবলম্বন কর।"

৩য়—اِزْهَدْ فِيْمَا فِىْ اَيْدِى النَّاسِ "মানুষের হাতের কোন কিছুর আশা ও লিপ্সা রাখিও না." ৪র্থ—উপরে বর্ণিত আলোচ্য হাদীছটি।

এই হাদীছের শেষ অংশ.....الا ان فى الجسد مضغة "মানবদেহের মধ্যে একটি বিশেষ অংশ আছে যাহার উন্নতি-অবনতির উপর সম্পূর্ণ দেহের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে" এই তথ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইহাতে মানুষের সৃষ্টি-তত্ত্ব ও দেহ-তত্ত্বের ইঙ্গিত দানে মানবের প্রকৃত উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে এবং সতর্ক করা হইয়াছে যে—স্থূল দেহের উন্নতি অপেক্ষা সূক্ষ্ম আত্মার উন্নতির উপরই মানুষের প্রকৃত ও মুখ্য উন্নতি নির্ভর করে। আত্মার উন্নতি সাধিত না হইলে মানব জীবন বিফল ও অত্যন্ত বিড়ম্বনায় পতিত হয়।

উপরোক্ত বাক্যটি পূর্ণরূপে অনুধাবন করার জন্য মানব-দেহ সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্যমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক; যাহা অতিশয় উচ্চ পর্য্যায়ের ও গবেষণামূলক। তাই মনোযোগের সহিত ইহার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে।

মানুষের অজুদ বা অস্তিত্ব দুই ভাগে বিভক্ত—"স্থূলদেহ" যাহা বাহ্য দৃষ্টিতে বা যান্ত্রিক সাহায্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে এবং "সূক্ষ্ম আত্মা"+ যাহা ঐরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। মানুষের স্থূলদেহে সৃষ্টির মূলে যেরূপ বিভিন্ন উপাদান রহিয়াছে, যথা—পানি, মাটি, বায়ু ও অগ্নি সেরূপ তাহার এই ভৌতিক দেহাভ্যন্তরে পাঁচ প্রকারের আত্মাও রহিয়াছে। ১ম—পশুর আত্মা; যদ্দারা খাওয়া-শোওয়া, কামরিপু চরিতার্থ করা ইত্যাদি প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়। ২য়—হিংস্র জন্তুর আত্মা; যদ্দারা দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ ও রাগের বশীভূত হইয়া মারামারি কাটাকাটি করতঃ প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে; ৩য়—শয়তানের আত্মা; যাহার প্ররোচনায় পাপাচার, অহঙ্কার, মিথ্যা ও সূক্ষ্ম কুট-কৌশলের দ্বারা মানুষকে ধোকা দেওয়া ইত্যাদির প্রবৃত্তি উদিত হয়। ৪র্থ—ফেরেশতা-আত্মা; যদ্দারা সদাচার, ন্যায়পরায়ণতা, সততা, সত্যতা, পরোপকারিতা ও আল্লার বশ্যতা স্বীকার করা ইত্যাদির আগ্রহ ও আকর্ষণ জন্মিয়া থাকে। ৫ম—মনুষ্যত্বের আত্মা; যাহার কর্তব্য হইতেছে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় আত্মাকে বশ করতঃ উহাদিগকে কুপ্রবৃত্তির দিক হইতে

+ অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষও একটি প্রাণী বটে, কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষ কেবল-মাত্র নিম্ন জগতের ভৌতিক পদার্থের দ্বারাই সৃষ্ট নয়। মানুষের দেহ ভৌতিক পদার্থে সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দেহ-মধ্যস্থ মাটী, পানি, আগুন ও বায়ু জাতীয় পদার্থ নিচয়ের সংমিশ্রণে যে বাষ্প বা বিদ্যুৎ জাতীয় সূক্ষ্ম ও শক্তি-শালী পদার্থের সৃষ্টি হয়, সেই বাষ্পের দ্বারাই মানুষের নফছে-আম্মারা (প্রবৃত্তি) সৃষ্ট। ইহা অতি শক্তিশালী পদার্থ, এমনকি বিদ্যুৎ অপেক্ষাও বেশী শক্তিশালী। কিন্তু উহা ভাল-মন্দ বিবেচনা ও পরিণাম-চিন্তা বিবর্জিত। তদুপরি মানবদেহের সৃষ্টি মূলে উর্দ্ধ জগতের একটি জিনিষও মিশ্রিত রহিয়াছে। তাছাওফের পরিভাষায় সেই জিনিষটির নাম হইতেছে "রুহ"। উহাই মানবাত্মা এবং উহাই বিবেক ও আকলের আকর। "রুহ" উর্দ্ধ জগৎ হইতে আল্লার আদেশে মানুষের ভিতরে আবির্ভূত হয়।

ফিরাইয়া দিয়া ফেরেশতা-আত্মার সদগুণাবলীতে গুণান্বিত ও পরিচালিত করা এবং আল্লার মা'রেফাত ও মহব্বত হাছেল করতঃ দুনিয়াতে আল্লার খেলাফত তথা আল্লার হুকুম-আহকাম জারীর পরিবেশ কায়েম করা।

প্রথমোক্ত তিনটি আত্মাকেই তাছাওফের পরিভাষায় "নফ্ছে আম্মারা" বলা হয় এবং চতুর্থ ও পঞ্চম এই দুইটিকে রুহ, আ'কল বা লতিফা বলা হয় এবং এইটিই হইতেছে বিবেক, বুদ্ধি ও মানবাত্মা। এতদদৃষ্টে দেখা গেল যে—ঐ পাঁচ প্রকারের আত্মাই তাছাওফের পরিভাষায় দুই নামে পরিচিত হইয়াছে। একটি হইল—নফ্ছে আম্মারা; ইহার তিনটি বিভাগ যথা—পশুর আত্মা, হিংস্র জন্তুর আত্মা ও শয়তানের আত্মা। দ্বিতীয় হইল—রুহ অর্থাৎ মানবাত্মা বা বিবেক ও আ'কল; ইহার দুইটি বিভাগ যথা—ফেরেশতা-আত্মা ও মনুষ্যত্বের আত্মা।

রসুলুল্লাহ (দঃ) الا ان فى الجسد مضغة বলিয়া মানব দেহের যে বিশিষ্ট অংশটির প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়াছেন, সে অংশটিই হইতেছে এই রুহ্ বা আ'কল ও বিবেক। ইহার উন্নতিতে পূর্ণ মানব দেহের উন্নতি এবং ইহার অবনতিতে সম্পূর্ণ মানব দেহের অবনতি ঘটিয়া থাকে; তাহাই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ

অর্থাৎ রুহ বা জ্ঞান-বিবেক রত্নটির উন্নতি সাধিত হইলে সমগ্র মানব দেহেরই উন্নতি হইবে এবং উহার অবনতিতে সমগ্র মানব দেহেরই অবনতি ঘটিবে।

এখন দেখিতে হইবে যে, ঐ অংশটির উন্নতির অর্থ কি? বস্তুতঃ প্রতিটি জিনিষের উন্নতি বা অবনতির বিচার করা হয় উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সুষ্ঠুতার দ্বারা। তাই এখানে দেখিতে হইবে যে রুহ বা বিবেকের উপর কি কি দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। কারণ, রুহ্—মানবাত্মা বা বিবেক বলিয়া যে দুইটি আত্মার নামকরণ হইয়াছিল অর্থাৎ ফেরেশতা-আত্মা ও মনুষ্যত্বের আত্মা উহাদের কর্তব্য ছিল সদাচার, সততা, সত্যতা ও আল্লার বশবর্তীতা ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নফ্ছের মধ্যে যে অপর তিনটি শক্তি বা আত্মা আছে উহাদিগকে বশে আনিয়া ফেরেশতা-আত্মার সদগুণাবলীতে পরিচালিত করা, অতএব রুহ বা বিবেকের দায়িত্ব এবং কর্তব্যও তাহাই হইবে। এই মহান কর্তব্য পালনে রুহ্—মানবাত্মা বা বিবেক যতটুকু উন্নতি করিতে পারিবে, পূর্ণ মানব দেহটি ততটুকুই উন্নতি লাভ করিবে। এমনকি অবশেষে ঐ রুহ্—মানবাত্মা যে উর্দ্ধ জগৎ হইতে আসিয়াছিল পুনরায় সে মানবদেহকে লইয়া সেই উর্দ্ধ জগতে অর্থাৎ—বেহেশতে যাইয়া পৌছিবে। পক্ষান্তরে রুহ্—মানবাত্মা নিজের ঐকর্তব্যে ত্রুটি করতঃ নিজেই যদি নফ্ছ তথা ঐ তিন প্রকার আত্মার বশ্যতা স্বীকার করার অবনতিতে পতিত হয়, তাহা হইলে পূর্ণ মানবদেহই অবনতির তিমির গর্তে পতিত হইবে। অবশেষে ঐ রুহ্—মানবাত্মা মানবদেহকে লইয়া সর্ব নিম্ন জগতে তথা জাহান্নামে পৌছিবে।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানবিশারদগণ রূহ্ বা বিবেকের উন্নতির পাঁচটি স্তর বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। পূর্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছিল যে, রূহ্—মানবাত্মা বা আ'কল ও বিবেককে তাছাওফের পরিভাষায় "লতিফা" নামেও নামকরণ হইয়া থাকে। সেই অনুসারেই রূহের উন্নতির পাঁচটি স্তরের নিম্নলিখিতরূপে নামকরণ করা হইয়াছে। যথা—(১) লতিফায়ে-ক্বাল্‌ব; মানুষ যখন আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লার নাম উচ্চারণ করতঃ জেকের করে তখন সে এই লতিফায়ে-ক্বাল্‌বের কর্তব্য পালন করে। (২) লতিফায়ে-রূহ্; মানুষ যখন আল্লার মহৎ গুণাবলীর ধ্যান করে এবং ঐ ধ্যানের দ্বারা নিজের মধ্যেও ঐ গুণের প্রতিবিম্ব হাসিল করে, যেমন—আল্লাহ দয়ালু, দয়াময় ইহার ধ্যান করতঃ এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে যে, আমাকেও দয়ালু হইতে হইবে এবং দয়ালুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইবে; তখন হয় লতিফায়ে রূহের কর্তব্য পালন। (৩) লতিফায়ে-সের´; মানুষ যখন আল্লার গুণাবলীর প্রতিবিম্ব নিজের মধ্যে হাসিল করায় সচেষ্ট হয় তখন তাহার ছিনার অভ্যন্তরে আল্লার মা'রেফাতের তথা আল্লার গুণাবলীর তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়; ইহাই হইতেছে লতিফায়ে-সের´-এর কর্তব্য। (৪) লতীফায়ে-খফী; মানুষের মধ্যে যখন আল্লার মা'রেফাতের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায় তখন মানুষ আল্লার গুণে মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া আল্লার আশেক ও প্রেমিকে পরিণত হইয়া যায় এবং নিজের নফ্‌ছের সব কুপ্রবৃত্তির প্রতি ঘৃণা জন্মিয়া যায় এবং সেগুলিকে ফানা ও বিলুপ্ত করিয়া দেয়—অর্থাৎ সেগুলিকে পূর্ণরূপে দখল ও অধিকার করার শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করে; ইহাই হইতেছে লতিফায়ে-খফীর কর্তব্য। (৫) লতিফায়ে-আখ্‌ফা; মানুষ ফানা-ফিল্লাহ অর্থাৎ নফ্‌সের সমুদয় কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দখল ও দমন করার সামর্থ্য লাভ করার পর, বকা-বিল্লাহ্ তথা আল্লার গুণে গুণান্বিত হওয়ার মর্তবায় পৌছে, যাহাকে আল্লার খেলাফত লাভ বলে; ইহাই হইতেছে লতিফায়ে-আখ্‌ফার মর্তবা ও মর্য্যাদা। এই অবস্থাতেই রূহ্ বা বিবেক ও আ'ক্বলের পূর্ণ শুদ্ধি হইয়া যায়। এই অবস্থার পরে আর বিবেক ও আ'খলাক কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইতে হয় না। রসুলুল্লাহ (দঃ) মানবকে স্বীয় আ'ক্বল ও বিবেককে সঠিক করার যে প্রেরণা দান করিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য হইতেছে মানবাত্মার চরম ও পরম উন্নতির উচ্চ পর্য্যায়।*

গণীমতের× পঞ্চমাংশ ইসলামী ষ্টেটকে দেওয়া এবং উহা উসুল করা ইসলামের একটি অঙ্গ

পাঠকবৃন্দ। দুনিয়াতে বিভিন্ন প্রকারের ধর্মমত ও তৎসম্পর্কিত মতবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু উহার কোনটিতেই মানুষের পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন বা জীবন যাপন প্রণালীর

---

* উল্লেখিত হাদীছের বিস্তারিত তথ্যাবলী মাওলানা শামছুল হক সাহেব কর্তৃক বর্ণিত।

× গণীমতের মাল কাহাকে বলে—৩২নং হাদীছের ফুটনোট দেখুন।

পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা দেখা যায় না। কোনটিতে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক এবাদৎ-বন্দেগী অর্থাৎ পরলৌকিক জীবন-দর্শন সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু জাগতিক জিন্দেগী সম্বন্ধে কোনই ব্যবস্থা নাই। আবার কোনটিতে শুধু পার্থিব জীবন অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ের কোন ব্যবস্থাই উহাতে নাই। ইসলাম যেহেতু কোনও মানুষের মনগড়া মতবাদ নয়, বরং ইহা সমস্ত জগতের মানব জাতির জন্য সমভাবে কল্যাণকর ও সম্যকরূপে মঙ্গল বিধায়ক এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যাহা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান আল্লার দরবার হইতে তাঁহারই নিয়োজিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ প্রতিনিধি রসুল (দঃ) কর্তৃক আনীত ও প্রচারিত। তাই ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন ও পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা সম্বলিত মানবধর্ম। ইহাতে মানব জীবনের প্রয়োজনীয় কোন একটি দিকও বাদ পড়ে নাই বা কেবলমাত্র কোনও একদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া অন্য দিককে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। তাই দেখা যায়—ইসলাম ধর্মের মধ্যে আধ্যাত্মিক চরম উন্নতি সাধনের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক তথা—পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবস্থা সমূহও উহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যেমন—প্রকৃত শান্তিদাতা আল্লার আইন জারী করতঃ দুনিয়াতে শান্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করার জন্য জেহাদকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কৃষি, শিল্প বাণিজ্য, চাকুরী বা মজদুরী ইত্যাদি দ্বারা হালাল উপায়ে অর্থ উপার্জন করাকেও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বিবাহের দ্বারা শুদ্ধরূপে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন পূর্বক দুনিয়া আবাদ করাকেও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তদ্রূপ ইসলামী ষ্টেটের বহনেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য নানাপ্রকার আয়ের পথকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে গণীমতের মাল হইতে এক পঞ্চমাংশ ইসলামী ষ্টেটে জমা দেওয়া এবং উহা রাষ্ট্রীয় আয়রূপে উসুল করাও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষ ব্যবস্থা।

ইমাম বোখারী (রঃ) এখানে তাহাই একটী হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন।

৪৮। হাদীছঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন— (তদানীন্তন আরবে) আবদুল কায়েস নামক একটি গোত্র ছিল (তাহারা বাহরাইন নামক স্থানে বসবাস করিত)। তাহাদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে আসিল। প্রাথমিক পরিচয়াদির পর রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন—লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হইবার পূর্বেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুগত হওয়ায় আপনাদিগকে ধন্যবাদঞ্চ। তাহারা আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! জিল্‌কদ, জিলহজ্জ, মোহাররম ও রজব এই চারিটি বিশেষ সম্মানিত মাস ব্যতীত অন্য সময় আমরা আপনার খেদমতে হাজির হইতে

ঞ্চ অর্থাৎ যুদ্ধের দ্বারা বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার পূর্বেই অনুগত হওয়ায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ। নতুবা লাঞ্ছিত, অপমানিত হইতে হইত এবং এখন সাক্ষাতে উভয়েরই লজ্জা বোধও হইত।

অক্ষম। কারণ, আপনার দরবারে উপস্থিত হওয়ার পথিমধ্যে "মোজার" গোত্রীয় কাফেরদের বাসস্থান, (তাই অন্য সময় যাতায়াত করা আমাদের জন্য সম্ভবপর ও নিরাপদ নহে+)। আপনি আমাদিগকে কয়েকটি স্পষ্টতর উপদেশ ও আদেশ-নিষেধ বলিয়া দিন, যাহা অনুসরণ করিয়া আমরা সকলে বেহেশত লাভের উপযুক্ত হইতে পারি। এতদ্ব্যতীত তাহারা (সেকালের) প্রচলিত পানীয় সমূহের (মধ্যে হালাল-হারামের) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রথমতঃ তাহাদিগকে চারিটি কর্তব্যের আদেশ করিলেন—(১) এক আল্লার উপর ঈমান আনার আদেশ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"এক আল্লার উপর "ঈমান" কাহাকে বলে জান কি ? তাহারা আরজ করিল, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই (দঃ) তাহা ভালরূপ বলিতে পারেন। তিনি বলিলেন, উহার অর্থ এই—কায়মনোবাক্যে এই অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তি করা যে, একমাত্র আল্লাহই মা'বুদ (অর্থাৎ তাঁহার প্রেরিত ও মনোনীত মতবাদ—ইসলামই একমাত্র গ্রহণীয়, আমি উহাকেই গ্রহণ করিতেছি।) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনও মা'বুদ নাই (অর্থাৎ—অন্য সকল প্রকার মতবাদ বর্জনীয়, সুতরাং সে সব আমি বর্জন করিতেছি।) এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার রসুল ✝ (অর্থাৎ—তাঁহার বর্ণিত সকল আদেশ-নিষেধ ও প্রদর্শিত আদর্শসমূহ আল্লার তরফ হইতেই প্রেরিত ও মানব জাতির জন্য নির্দ্ধারিত প্রকৃত সত্য আদর্শ; এতদ্ব্যতীত অন্য সকল প্রকার আদর্শই বাতিল ও বর্জনীয়।) (২) নামায উত্তমরূপে আদায় করা। (৩) যাকাত দান করা। (৪) রমজান মাসের রোযা রাখা এবং গণীমতের মালের পঞ্চমাংশ (বাইতুল মালে জমা) দেওয়া। ইহা ছাড়া রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে চারিটি বস্তু (ব্যবহার করিতে) নিষেধ করিলেন×—(সেকালে আরব দেশে চারি প্রকার পাত্র প্রসিদ্ধ ছিল যাহাতে মদ্য তৈরী করা হইত। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে ঐ সকল পাত্রে তৈরী পানীয় বস্তু, এমনকি যে কোন কার্য্যে ঐ সমস্ত পাত্রের ব্যবহারও নিষেধ করিলেন; যেন পাত্র দেখিয়া মদের

+ সে কালের কাফের মোশরেকরাও উক্ত চারিটি মাসকে সম্মানিত গণ্য করিত। এই চারি মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটি হত্যা-লুণ্ঠন হইতে সকলেই বিরত থাকিত।

✝ এখানে একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে আল্লার সাচ্চা রসুলরূপে মানিয়া ও গ্রহণ করিয়া লওয়াকে আল্লার উপর ঈমান আনারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য করা হইয়াছে। কারণ "এক আল্লার উপর ঈমান"এর ব্যাখ্যা দুইটি বিষয়ের যুগপৎ সমন্বয়ের দ্বারা করা হইয়াছে অর্থাৎ এক আল্লাহকে মা'বুদ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কেও সত্য রসুলরূপে মানিয়া লওয়া। সুতরাং মোহাম্মদ (দঃ)কে রসুলরূপে মানিয়া লওয়া ব্যতিরেকে শুধু তাওহীদ অর্থাৎ এক আল্লাহকে মা'বুদ বলিয়া স্বীকার করাকে "আল্লার উপর ঈমান" গণ্য করা হইবে না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণ দ্বিতীয় খণ্ডে ৭২৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে।

× হাদীছের মধ্যে ঐ চারিটি পাত্রের নাম নিম্নলিখিতরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—حنتم এক প্রকার সবুজ রঙ্গের কলসী। نقير খেজুর গাছের গুলির মধ্যস্থল খোলা করিয়া মটকার ন্যায় তৈরী এক প্রকার পাত্র। دباء শুকনা কদুর খোলা বা বাওয়াস। مقير চতুষ্পার্শে বার্নিশ করা, চিনা মাটির তৈরী বোয়েম বিশেষ। (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

কথা মনে পড়িয়া না যায় বা কেহ অন্য জিনিষের ছলনায় মদ্য তৈরী করিতে না পারে।) রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে ইহাও বলিলেন, এই সব আদেশ-নিষেধকে আপনারা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লউন এবং দেশে গিয়া সকলকে ইহা জানাইয়া দিবেন।

ছওয়াবের নিয়্যতে কাজ করার উপরই আমলের ছওয়াব নির্ভর করিয়া থাকে

নেক কাজের নিয়্যতেও ছওয়াব হয়, যেমন হাদীছে আছে ولكن جهاد ونية মক্কা নগরী মোসলমানদের করতলগত হওয়ার পর যখন মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করার মত অতি বড় একটি ছওয়াবের কাজের হুকুম রহিত হইল, তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—জেহাদ করিয়া ছওয়াব হাসিলের পথ এবং জেহাদের নিয়্যত ও প্রয়োজন হইলে হিজরত করিব এই নিয়ত দ্বারা ছওয়ার হাছিলের পথ সর্বদাই খোলা থাকিবে।

৪৯। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন—যখন কেহ ছওয়াব হাসিলের নিয়্যতে স্বীয় পরিবারবর্গের জন্য টাকা পয়সা খচর করে, তখন তাহার ঐ খরচ ছদকারূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

৫০। **হাদীছ ঃ**—সা'দ ইবনে আবু অক্কাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তুমি যাহা কিছু খরচ করিবে উহার ছওয়াব নিশ্চয় পাইবে ; এমনকি স্ত্রীর (প্রতি ভালবাসা দেখাইয়া আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাহার) মুখে লোক্‌মা (খাদ্য-গ্রাস) তুলিয়া দেওয়াতেও ছওয়াব হইবে।

অর্থাৎ সাধরণ দৃষ্টিতে যাহাকে ছওয়াবের আমল গণ্য করা হয় না, কিন্তু সঠিক নিয়্যত দ্বারা উহাতেও, এমনকি শরীয়ত অনুমোদিত আনন্দ উপভোগের কাজেও ছওয়াব হাসিল হয়।

হিত ও মঙ্গল কামনা বড় ধর্ম

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—হিত কামনা করা এবং মঙ্গল কামনা করাই ধর্ম। আল্লার (দ্বীনের) মঙ্গল কামনা করা, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের (আদর্শ ও মিশনের) মঙ্গল কামনা করা, (খাঁটী) মোসলমান শাসনকর্তাদের মঙ্গল কামনা করা ও সর্বসাধারণ মোসলমানদের মঙ্গল কামনা করা।

ব্যাখ্যা ঃ—আল্লার দ্বীনের মঙ্গল কামনার অর্থ আল্লার দ্বীনকে মনে প্রাণে গ্রহণ পূর্বক জীবনের প্রতি স্তরে উহাকে যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিফলিত করা এবং উহার তবলীগ অর্থাৎ সাধারণ্যে প্রচার ও বিস্তারের জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট হওয়া, প্রয়োজনে জেহাদ করিয়া উহার উপর যাবতীয় সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করা।

প্রাচীনকালে আরবদেশে এই সকল পাত্রে শরাব অর্থাৎ মদ্য তৈয়ার করা হইত, কারণ এগুলির মধ্যে পানীয় বস্তুতে দ্রুত মাদকতা সৃষ্টি হইতে। মদ্যপান হারাম (নিষিদ্ধ) হওয়ার প্রাথমিক অবস্থায় ঐ সকল পাত্রের ব্যবহারও নিষিদ্ধ ছিল, পরে অবশ্য শুধু মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু সাধারণ কার্যে ঐ সব পাত্রের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা মনছুখ বা রহিত হইয়াছে।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মঙ্গল কামনার অর্থ তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শ মনেপ্রাণে গ্রহণ পূর্বক অবিচলিত ভাবে উহার অনুসরণ করিয়া যাওয়া ও সর্বদা তাঁহার অনুগত থাকা এবং তাঁহার আদর্শকে সর্বপ্রকার বাধা বিপত্তির হাত হইতে রক্ষা করতঃ তাঁহার আদর্শ ও মিশনকে সারা বিশ্বে সমুন্নত রাখার চেষ্টায় ব্রতী থাকা।

খাঁটী মোসলমান শাসনকর্তার মঙ্গল কামনার অর্থ এই—ন্যায় বিচারক ও সদাচারী মোসলমান শাসনকর্তার সর্বপ্রকার ন্যায় নীতি ও আইন-কানুনের অনুগত থাকা এবং ন্যায় কাজে সহযোগীতা করিয়া যাওয়া, অন্যায়ভাবে তাঁহার প্রতি বিদ্রোহী না হওয়া।

মোসলমান জনসাধারণের মঙ্গল কামনার অর্থ তাহাদের সর্বপ্রকার হক আদায় করা, তাহাদের মধ্যে "আম্‌র-বিল-মারূফ ও নিহি আনিল-মোনকার" অর্থাৎ সৎপথ প্রদর্শন ও কুপথ হইতে বিরত রাখার চেষ্টা সর্বদা করিয়া যাওয়া। সর্বাবস্থাতেই সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহার বজায় রাখিয়া চলা। বিশেষতঃ স্বীয় গুণ বা পদমর্য্যাদা ও সাধ্যানুসারে সর্ব-সাধারণের উপকার ও উন্নতির জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করা। যেমন—কোন ব্যক্তি ডাক্তার হইয়াছে, সে ডাক্তারি করিয়া শুধু টাকা উপার্জন করিলেই চলিবে না। বরং সর্বসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে এবং গরীব-দুঃখীর উপকারার্থে সাধ্যানুযায়ী সচেষ্ট হইবে। অথবা কোন ব্যক্তি ধনাঢ্য হইয়াছে, সে শুধু নিজের পেটই ভরিলে, এমনকি কেবলমাত্র যাকাৎ, ফেৎরা আদায় করিয়া ক্ষান্ত হইলেই চলিবে না। তাহাকে সর্বসাধারণের উপকার ও গরীব কাঙ্গালের সাহায্য যথাসাধ্য করিয়া যাইতে হইবে। ধনাঢ্য ব্যক্তির মালের উপর যাকাৎ ভিন্ন আরও হক রহিয়াছে। কোরআন শরীফে ২ পারা ৬ রুকুতে আছে—

.....وآتى المال على حبه ذوى القربى..... "খাঁটী মোমেন উহারাই, যাহারা নামাজ কায়েম করে, যাকাৎ দান করে, এতদ্ভিন্ন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিছকিন, অসহায়-পথিক ও যাচ্ঞাকারীকে দান করে।"

হাদীছে আছে—"মালের উপর যাকাৎ ভিন্ন আরও অনেক হক আছে।" (তিরমিজী)

হাদীছে আরও আছে—ليس المؤمن الذى يشبع وجاره جائع الى جنبه

অর্থ:—"ঐ ব্যক্তি মোমেন নহে—যে নিজে পেট ভরিয়া খায় ও তাহার প্রতিবেশী তাহার নিকটেই অনাহারে দিন কাটায়।" (মেশকাত শরীফ)

এইরূপে যে ব্যক্তি আলেম তাহার কর্তব্য দ্বীনের শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিয়া যাওয়া এবং সর্বসাধারণকে সৎপথে পরিচালিত করার আন্তরিক আগ্রহের সহিত লাগিয়া থাকা—যেমন রসুলুল্লাহ (দঃ) করিতেন। মানবজাতিকে সৎপথে আনয়নে তাঁহার কি অপরিসীম আগ্রহ ও বিরামহীন চেষ্টা যত্নই না ছিল। যদ্দরুণ আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا

"মনে হয় আপনি এই অনুতাপে প্রাণ দিয়া দিবেন যে, কাফেররা কেন ঈমান আনে না।" (১৬ পারা ১৩ রুকু)

এইরূপে শারীরিক শক্তি সামর্থ্য দ্বারাও জনগণের বিপদ উদ্ধারে আপ্রাণ চেষ্টা করা চাই। এ সবই হইল সর্বসাধারণের মঙ্গল কামনার অর্থ। এতদ্ব্যতীত ইহার আরও দুইটি শাখা আছে। যথা—

প্রথমতঃ এই যে, কোনও সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হইলে তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত কার্য্যাবলী ও দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে নির্বাহ করতঃ সর্বসাধারণের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা।

দ্বিতীয়তঃ এই যে, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কোনও ক্ষমতার অধিকারী হইলে সেই ক্ষমতার বিন্দুমাত্র অপব্যবহার না করিয়া স্বার্থপরতা, লোভ, মোহ, স্বজন-প্রীতি ইত্যাদি সর্বপ্রকার দুর্নীতি ত্যাগ পূর্বক জনগণের একনিষ্ঠ খাদেমরূপে কাজ করিয়া যাওয়া।

৫১। হাদীছঃ—জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে হাত দিয়া বায়আ'ত ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছি যে—নামায যথাসাধ্য উত্তমরূপে আদায় করিব, যাকাৎ দান করিব, প্রত্যেক মোসলমানের খায়েরখাহী বা হিত সাধন ও মঙ্গল কামনা করিব।

৫২। হাদীছঃ—ছাহাবী মুগিরা ইবনে শোবা (রাঃ) কুফার শাসনকর্তা ছিলেন, হঠাৎ তিনি এন্তেকাল করেন। তখন জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) নামক ছাহাবী যাহাতে রাজ্যের মধ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হইতে পারে সে উদ্দেশ্যে সকলকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং সকলের উদ্দেশ্যে এক শুভেচ্ছামূলক বক্তৃতা করিলেন। তিনি প্রথমতঃ আল্লার প্রশংসা করিয়া তারপর বলিলেন—মোসলেম ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা এক খোদার ভয় সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখিবেন এবং সর্বদা শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবেন। যাবৎ নূতন শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া না আসেন আপনারা এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। নূতন শাসনকর্তা অতি সত্বরই নিযুক্ত হইয়া আসিবেন। তারপর বলিলেন—আপনারা মৃত শাসনকর্তার জন্য মাগফেরাতের (ক্ষমা প্রাপ্তির) দোয়া করুন। তিনি ক্ষমা করা ভাল বাসিতেন, আপনারা দোয়া করুন যেন আল্লাহ তাঁহাকে ক্ষমা করেন। তারপর তিনি বলিলেন—আমার এই বক্তৃতা করার একমাত্র কারণ এই যে, আমি যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে বায়আ'ত করিয়াছিলাম, তখন নবী (দঃ) আমার উপর এই শর্ত আরোপ করিয়াছিলেন যে, "সকল মুসলমানের মঙ্গল কামনা করিবে।" আমি সেই শর্তে বায়আ'ত করায় আপনাদের বর্তমান পরিস্থিতির যোগ্য মঙ্গল কামনা করিয়া এই বক্তৃতা করিলাম। এই বলিয়া তিনি নিজের ও সকলের জন্য এস্তেগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ মিম্বার হইতে নামিয়া আসিলেন।

● এই বক্তৃতায় মৃত শাসনকর্তার মঙ্গল কামনা করা হইল যে, তাঁহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া নিজেও করিলেন এবং অন্য সকলকে উহার আহ্বান জানাইলেন। সর্বসাধারণের মঙ্গল কামনা করা হইল যে, তাহাদিগকে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির হাত হইতে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়*

এল্‌ম

এ'লেমের ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা

কোরআন শরীফে আছে—

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

অর্থ:—যাঁহারা ঈমান আনিয়াছেন এবং বিশেষতঃ এল্‌ম হাসিল করিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদিগকে অনেক উচ্চাসনের অধিকারী করিবেন (২৮ পাঃ ২ রুঃ)।

এল্‌ম ব্যতীত মানুষ উন্নতি লাভ করিতে পারে না, তাই আল্লাহ তায়ালা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে এল্‌মের উন্নতি এবং জ্ঞান বর্দ্ধনের দোয়া শিক্ষা দান করিয়াছেন এবং সেই দোয়া করার আদেশ করিয়াছেন। (১৬ পাঃ ১৫ রুঃ)

قل رب زدنى علما "আপনি বলুন—হে প্রভু! আমার এল্‌ম বর্দ্ধিত করিয়া দিন।

এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন— انما يخشى الله من عباده العلماء "আল্লার বান্দাদের মধ্যে আলেমগণের অন্তরেই খোদার ভয় থাকে।"+ (২০ পাঃ ১৬ রুঃ)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন (২৩ পাঃ ১৫ রুঃ)—

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

"এল্‌মের অধিকারীগণ এবং এল্‌মহীনগণ কখনও সমপর্য্যায়ের হইতে পারে কি?"

আরও আছে— قَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْٓ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ

"দোযখবাসীরা এই বলিয়া আক্ষেপ করিবে যে, হায়! (দুনিয়ায় থাকাকালে) যদি আমরা (দ্বীনের কথা) অন্যের নিকট হইতে শুনিয়া শিক্ষা করিতাম বা অন্ততঃ বিবেক বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম-জ্ঞান লাভ করিতাম, তবে (আজ) আমরা দোযখীদের দলভুক্ত হইতাম না" (২৯ পারা ১ রুকু)

---

* এই অধ্যায়ের পরিচ্ছেদগুলির আসল বিষয়বস্তু ঠিক রাখিয়া পাঠকদের সুবিধার্থে উহার ধারাবাহিকতার মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন শিরোনামা একত্রিকরণও হইয়াছে।

+ এই আয়াতের দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান ও খাঁটী এল্‌মের নিদর্শন বা আলামত এইরূপে নির্দ্ধারিত হয় যে—যে জ্ঞান ও এল্‌ম আল্লার ভয়-ভক্তির বাহক ও অছিলা হয় এবং যদ্দ্বারা মানুষের মনে আল্লার ভয় ও ভক্তির সঞ্চার হয়, উহাকেই প্রকৃত জ্ঞান ও এল্‌ম বলা যাইতে পারে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—(১৬ পৃঃ)

إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ -

উপরোক্ত হাদীছটি একখানি দীর্ঘ হাদীছের অংশ বিশেষ। সম্পূর্ণ হাদীছটির পূর্ণ বিবরণ এইরূপ—দামেস্ক শহর মদীনা শরীফ হইতে প্রায় ছয় শত মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে আবুদ-দরদা (রাঃ) নামক বিশিষ্ট ছাহাবী বাস করিতেন। একদা এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে আবুদ-দরদা (রাঃ)! আমি মদীনা হইতে দীর্ঘ ছয় শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আপনার নিকট পৌঁছিয়াছি শুধু মাত্র এই উদ্দেশ্যে যে, আমি শুনিতে পাইয়াছি, আপনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে একখানা হাদীছ বর্ণনা করিয়া থাকেন, ঐ হাদীছখানা আমি আপনার নিকট হইতে শুনিব, ইহা ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যে আমি এখানে আসি নাই। তখন আবুদ-দরদা (রাঃ) বলিলেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—(১) যে ব্যক্তি এলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে পথ অতিক্রম করিবে, আল্লাহ তায়ালা সেই অছিলায় তাহার জন্য বেহেশতের পথ সহজ ও সুগম করিয়া দিবেন। (২) নিশ্চয় জানিও, দ্বীনের শিক্ষা ও জ্ঞান অন্বেষণকারী তালেবে-এলমকে সন্তুষ্ট করার জন্য ফেরেশতাগণ তাঁহাদের সম্মুখে স্বীয় পাখা ও ডানা বিছাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করেন (এবং ফেরেশতাগণ তালেবে-এলমদের খেদমতে রত থাকেন।) (৩) সাত আসমান ও ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত সকল জীব এমনকি পানির মধ্যে অবস্থানকারী মৎস্য জাতীয় জীবজন্তু পর্য্যন্ত আলেমের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিতে থাকে*। (৪) একজন শরীয়তের পায়রবীকারী খাঁটী আলেম যিনি সর্বদা এলম চর্চায় রত থাকার দরুন অন্য কোনও নফল এবাদৎ বা অজিফা ইত্যাদির জন্য সময় পান না, তাঁহার মর্য্যাদা ও ফজিলত একজন এলমহীন আবেদ—নফল এবাদৎ-বন্দেগীতে মশগুল ব্যক্তির তুলনায় এরূপ, যেমন পূর্ণিমার চাঁদের মর্য্যাদা

* কারণ খাঁটী আলেমগণ দ্বারা দুনিয়াতে আল্লার দ্বীনের উন্নতি হওয়ায় তাঁহাদের অছিলায় দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার রহমত বর্ষিত হয়, যদ্দ্বারা দুনিয়ায় অবস্থানকারী সকল প্রাণীই লাভবান হইয়া থাকে। যেমন সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত না হইলে পশু পাখী, মৎস্য ইত্যাদি সকল জীবই নিস্তেজ ও অধীর হইয়া পড়ে এবং নববর্ষের বৃষ্টি বর্ষণে প্রাণী মাত্রই সতেজ, আনন্দমুখর ও পুলকিত হইয়া উঠে। দুনিয়াতে বৃষ্টিপাত ইত্যাদি আল্লার রহমত খাঁটী আলেমগণের দ্বারা আল্লার দ্বীন জারী হওয়ার বদৌলতেই হইয়া থাকে এবং আল্লাহ-প্রদত্ত অনুভূতির দ্বারা প্রত্যেক প্রাণীই আল্লার রহমতের সেই অছিলাকে উপলব্ধি করিতে পারে বলিয়া তাহারা সেই অছিলা তথা আলেমগণের জন্য ক্ষমা ও মাগফেরাতের দোয়া করিয়া থাকে।

সাধারণ নক্ষত্রের উপর পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। (৫) নিশ্চয় জানিও আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী। এই পৃথিবীতে নবীগণের ত্যাজ্য সম্পত্তি একমাত্র এল্‌ম। যে ব্যক্তি উহা হাসিল করিয়াছে সে অতি মূল্যবান সম্পদ লাভ করিয়াছে (মেশকাত শরীফ)। বোখারী শরীফে উল্লেখিত হাদীছটির শুধু ৫ নং ও ১নং বিষয় দুইটি উল্লেখ আছে।

বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত আবু-জর গেফারী (রাঃ) বলেন, আমাকে কতল বা হত্যা করার জন্য যদি তোমরা আমার গর্দানের উপর তরবারি রাখিয়া দাও এবং আমি বুঝিতে পারি যে, তরবারি চালিত করিয়া আমার কতল ক্রিয়া সম্পন্ন করার পূর্ব মুহূর্তে আমি এতটুকু সময় ও সুযোগ পাইব যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি মাত্র বাণী তাঁহার উম্মতগণকে শিক্ষাদান করিতে বা তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারিব, তবে তাহাও আমি অবশ্যই করিব, ততটুকু সুযোগও আমি কখনও হাতছাড়া হইতে দিব না।

ওমর (রাঃ) বলিতেন, تفقهوا قبل ان تسودوا "সর্দার বা নেতা নির্বাচিত অথবা কর্মকর্তা নিয়োজিত হইবার পূর্বে তোমাদের তাফাক্কোহ অবশ্যই হাসিল করিতে হইবে।" (১৭ পৃঃ)

এখানে 'তাফাক্কোহ' হাসিল করার অর্থ কেবলমাত্র এল্‌ম হাসিল করাই নহে, বরং কোরআন ও রসুলের (দঃ) সুন্নত তথা হাদীছের ভিতরে সমুদয় আধ্যাত্মিক বিষয়াদি সহ জাগতিক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে যে আলো দান করা হইয়াছে এবং আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার যে সব সমাধান তাহাতে দেওয়া হইয়াছে এবং রসুলের (দঃ পরবর্তী যুগত্রয়ে অর্থাৎ ছাহাবাগণের যুগে, তাবেয়ীগণের যুগে ও তাবয়ে-তাবেয়ীগণের যুগে পরবর্ত্তী সমস্যা সমূহের যে সব সমাধান তাঁহারা কোরআন ও হাদীছের আলোতে দান করিয়া গিয়াছেন সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে এক একটি করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে এবং এসবকে জ্ঞানের মূলধনরূপে হাতে লইয়া ভবিষ্যৎ-কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে; যাহাতে সেই মূলধনরূপী জ্ঞান-প্রদীপের আলোতে সম্মুখবর্তী প্রতিটি সমস্যার সমাধান খুজিয়া পাওয়া যায় এবং সর্বস্তরেই ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা সৎ-অসৎএর বিচার বিশ্লেষণ করা সহজ হয়। খলীফা ওমর (রাঃ) কর্তৃক এই আদেশ জারীর পর হইতেই তাফাক্কোহ হাসিলের ট্রেনিং প্রথা চালু করা হইয়াছিল। নৈতিক ট্রেনিং এর সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক ট্রেনিং এরও ব্যবস্থা ছিল।

কথার মধ্যভাগে প্রশ্নের উত্তরদানে বিলম্ব করা

৫৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদিন মজলিসে কোন একটি বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় একটি গ্রাম্য লোক আসিয়া (ঐ আলোচনারত অবস্থায়ই) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেয়ামত কবে আসিবে? রসুলুল্লাহ (দঃ) (ঐ প্রশ্নের উত্তরে কিছু না বলিয়া) স্বীয় বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহাতে কেহ কেহ মন্তব্য করিল যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) হয়ত প্রশ্নটি শুনিয়াছেন, কিন্তু এইভাবে প্রশ্ন করা নাপছন্দ করিয়াছেন। আর কেহ কেহ মন্তব্য করিল

যে, হয়ত তিনি প্রশ্নটি আদৌ শুনিতে পান নাই। কিন্তু বক্তব্য শেষ করিয়া রসুলুল্লাহ (দ:) জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রশ্নকারী কোথায়? সে ব্যক্তি আরজ করিল, আমি উপস্থিত আছি ইয়া রসুলাল্লাহ।*

নবী (দ:) বলিলেন—যখন আমানতের খেয়ানত করা হইতে থাকিবে (তথা দায়িত্ব-জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত ও দায়িত্ব পালনের ত্রুটি হইতে থাকিবে) তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করা। (অর্থাৎ তখন মনে করিবে যে, কেয়ামত বা জগতের ধ্বংস ও প্রলয় নিকটবর্তী হইয়াছে)। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আমানতে খেয়ানতের রূপ কি হইবে? উত্তরে হযরত (দ:) বলিলেন, বিশেষত: হুকুমত ও রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনা বা শাসন ক্ষমতার ভার যখন অযোগ্য পাত্রে অর্পিত হইবে, অযোগ্য ও অবিশ্বস্ত লোকদিগকে যখন রাষ্ট্রীয় কার্য্যে ও ক্ষমতায় নির্বাচন বা নিযুক্ত করা হইবে, তখন জগৎ ধ্বংসের অপেক্ষা করিতে থাকিবে।

ব্যাখ্যা :—সকল প্রকার আমানতের খেয়ানত কেয়ামত বা জগৎ ধ্বংস নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। বিশেষত: শাসকগোষ্ঠির দ্বারা জনসাধারণের অর্থের অপচয় এবং রাষ্ট্রীয় কার্য্যে দায়িত্ব পালনের প্রতি অবজ্ঞা ও শাসন ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং রক্ষকের নামে ভক্ষকের অভিনয় ইত্যাদি বিশেষ ভাবে কেয়ামতের আলামতরূপে পরিগণিত।

এলমের কথা দরকার বশতঃ উচ্চৈঃস্বরে বলা †

৫৪। **হাদীছ :**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সফরে পথ চলিতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের পেছনে রহিয়া গিয়াছিলেন। আমরা আছর নামাযের প্রায় শেষ ওয়াক্তে এক স্থানে অজু আরম্ভ করিলে হযরত আমাদের নিকট পৌছিলেন। আমরা তাড়াহুড়া বশত: পূর্ণাঙ্গ পা না ধুইয়া কেবলমাত্র মুছিয়া ফেলার ন্যায় অসম্পূর্ণভাবে পা ধুইলাম, পায়ের গোড়ালী শুষ্ক থাকিল; উহাতে পানি পৌছিল না। নবী (দ:) আমাদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, এই সমস্ত পায়ের (শুষ্ক) গোড়ালী দোযখের অগ্নিতে দগ্ধ হইবে; দুই-তিনবার এইরূপ বলিলেন।

ওস্তাদ কর্তৃক শাগের্দগণের পরীক্ষা করা

৫৫। **হাদীছ :**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কেহ খেজুর গাছের মাথি (গাছের মাথার অভ্যন্তরস্থ মিষ্ট কোমল অংশ) আনিয়াছিল। হযরত তাহা খাইতে লাগিলেন এবং ছাহাবীগণকে লক্ষ্য

---

* কাহারও বক্তব্য শেষ করার পূর্বে কথার মধ্যভাগে প্রশ্ন করা যদিও বে-আদবী বটে, কিন্তু যেহেতু ঐ ব্যক্তি গ্রাম্য অশিক্ষিত লোক ছিল, তাই হযরত তাহার এই প্রকার প্রশ্নে তাহাকে তিরস্কার করেন নাই। প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বক্তব্য শেষে উত্তর দিয়াছেন।

† নবী (দ:) সাধারণত: নীচ স্বরে কথা বলিতেন এবং ইহাই সুন্নত।

করিয়া বলিলেন, এক প্রকার গাছ আছে যাহার পাতা কখনও ঝড়িয়া পড়ে না। মোমেন ব্যক্তির সাথে ঐ গাছের তুলনা হইতে পারে, (অর্থাৎ মোমেন ব্যক্তি যেমন সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে—সর্বাবস্থায় স্বীয় প্রভুর ভক্ত ও অনুরক্ত থাকে এবং পরোপকারে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া রাখে, তদ্রূপ ঐ গাছটিও সর্বাঙ্গীন পরোপোকারী এবং কোন ঋতুতেই উহার মধ্যে কোনও পরিবর্তন আসে না।) বল দেখি! সেই গাছটি কোন্ গাছ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সকলেরই ধারণা জঙ্গলের বিভিন্ন প্রকার গাছের প্রতি ধাবিত হইতে লাগিল। আমার মনে ধারণা হইল যে, উহা খেজুর গাছ হইবে; কিন্তু ঐ মজলিসের মধ্যে আমি সকলের চেয়ে বয়োকনিষ্ঠ ছিলাম, বড়দের সম্মুখে কিছু বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিলাম। ছাহাবীগণ শেষ পর্য্যন্ত বলিতে অপারগ হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনি বলিয়া দিন, উহা কি গাছ। হযরত (দঃ) বলিলেন, উহা খেজুর গাছ। তখন আমি আমার পিতা ওমর (রাঃ)কে আমার ঐ মনের কথা খুলিয়া বলিলাম। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, যদি তুমি উহা বলিয়া দিতে, তাহা হইলে আমি এতদুর সন্তুষ্ট হইতাম যে, দুনিয়ার কোনও শ্রেষ্ঠ ধন সম্পত্তি পাইলেও তদ্রূপ সন্তুষ্টিলাভ হইত না। (কারণ, তাঁহার মনের উত্তর সঠিক উত্তর ছিল। হযরত (দঃ) উহা শুনিলে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ে তিনি তাঁহার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হইতেন।)

দ্বীনের কথা যোগ্য লোক দ্বারা যাচাই করিয়া লইবে

৫৬। **হাদীছ**ঃ—ছাহাবী আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অনাবশ্যক প্রশ্নাবলীর দ্বারা কোন কোন ছাহাবী রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বিরক্ত করিয়া তুলিলে ঐ সম্পর্কে কোরআন শরীফের একটি বিশেষ আয়াত নাযেল হয়; যদ্দারা ঐ প্রশ্নাবলী হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাই ছাহাবীগণ রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রশ্ন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন এবং কোন বুদ্ধিমান বিদেশী আগন্তুকের প্রতীক্ষায় থাকিতেন। (কারণ নূতন আগন্তুক এই সকল বিধিনিষেধ সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকার দরুন খোলাখুলিভাবে প্রশ্ন করিবে, রসুলুল্লাহ (দঃ) উহার উত্তর দিবেন ও ছাহাবীগণ সেই উত্তর শুনিয়া তদ্দারা জ্ঞান ও এল্‌ম হাসিল করিবেন।)

একদা আমরা মসজিদের মধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মজলিসে বসিয়া ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি উটের উপর সওয়ার হইয়া আসিল এবং উট হইতে অবতরণ করিয়া উহাকে বাঁধিল; তারপর মসজিদের ভিতরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের মধ্যে মোহাম্মদ (দঃ) কে? (আনাছ (রাঃ) বলেন, ঐ সময়) নবী (দঃ) হেলান দেওয়া অবস্থায় আমাদের মধ্যস্থলে বসিয়াছিলেন। আমরা উত্তর করিলাম—এই যে হেলান দেওয়া উপবিষ্ট নূরানী চেহারাওয়ালা। অতঃপর সে নবী (দঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিল, আমি আপনার নিকট কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিব এবং কড়াকড়ির সহিত জিজ্ঞাসা করিব; আপনি তজ্জন্য মনে ব্যথিত হইবেন না। নবী (দঃ) বলিলেন, আপনার যাহা ইচ্ছা—মন খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তখন সে বলিল, আপনার প্রেরিত

এক ব্যক্তি আমাদিগকে বলিয়াছে, আপনি ইহা দাবী করিয়া থাকেন যে—আল্লাহ আপনাকে রসুল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন। নবী (দঃ) বলিলেন, সে সত্য এবং ঠিকই বলিয়াছে। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আসমান কে সৃষ্টি করিয়াছে? হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ। সে জিজ্ঞাসা করিল, এই সবের মধ্যে উপকারী বস্তুনিচয় কে সৃষ্টি করিয়াছে? নবী (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ। সে বলিল, আমি আপনার ও আপনার পূর্ববর্তী সকলের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা যিনি আসমান-জমিন সৃষ্টি করিয়াছেন, পাহাড়-পর্বত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং এই সবের মধ্যে অসংখ্য উপকারী বস্তুনিচয় রাখিয়াছেন—তাঁহার কসম দিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্যই কি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সমস্ত জগদ্বাসীর প্রতি রসুল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন? নবী (দঃ) উত্তর করিলেন—আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে সমস্ত জগদ্বাসীর প্রতি তাঁহার রসুল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন। অতঃপর ঐ লোকটি বলিল, যেই আল্লাহ আপনাকে রসুলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন আমি আপনাকে সেই আল্লার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—আল্লাহ তায়ালা কি আপনাকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, দিবা-রাত্রে আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিতে হইবে? নবী (দঃ) বলিলেন—আমি আল্লার কসম করিয়া বলিতেছি, আল্লাহই দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবার আদেশ করিয়াছেন। লোকটি ঐরূপেই বলিল, আমি আপনাকে আল্লার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—স্বয়ং আল্লাহই কি আপনাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমাদের পূর্ণ রমজান মাসের রোযা রাখিতে হইবে? নবী (দঃ) বলিলেন, আমি আল্লার কসম করিয়া বলিতেছি, স্বয়ং আল্লাহই আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমাদের পূর্ণ রমজান মাসের রোযা রাখিতে হইবে। লোকটি বলিল, আমি আপনাকে আল্লার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—স্বয়ং আল্লাহই কি আপনাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমাদের মালদারের নিকট হইতে যাকাত উসুল করিয়া গরীবদিগকে দান করিতে হইবে? নবী (দঃ) বলিলেন, আমি আল্লার কসম করিয়া বলিতেছি, স্বয়ং আল্লাহই আমাকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, ধনীদের নিকট হইতে যাকাত উসুল করিয়া গরীবদিগকে দান করিতে হইবে। লোকটি এইরূপে হজ্জের বিষয়ও প্রশ্ন করিল এবং নবী (দঃ) পূর্বোক্ত ঐরূপেই উত্তর দিলেন।

তারপর লোকটি বলিল, আমি আমার সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছি। আমার নাম জেমাম-ইবনে ছা'লাবাহ। লোকটি প্রত্যাবর্তনকালে শপথ করিয়া বলিল, যেই আল্লাহ আপনাকে সত্যের বাহকরূপে পাঠাইয়াছেন, সেই মহান আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, (আপনি যাহা কিছু আল্লার তরফ হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,) আমি উহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করিব না। লোকটির দৃঢ়তা দেখিয়া হযরত (দঃ) বলিলেন, যদি সে তাহার কথায় সত্যবাদী প্রমাণিত হয় তবে নিশ্চয়ই সে বেহেশতবাসী হইবে।

অভিজ্ঞ বিশ্বস্ত ব্যক্তি ধর্ম বিষয়ে কিছু লিখিয়া বা বিশ্বস্তসুত্রে পাঠাইয়া দিলে তাহা গ্রহণ যোগ্য

এই পরিচ্ছেদের মধ্যে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি বিশেষ জ্ঞানের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। উহা হইতেছে এই যে, একে অন্যের নিকট কোনও বিষয় ব্যক্ত করার তিনটি স্তর আছে, যথা—সাক্ষ্য, শিক্ষা ও সংবাদ। সাক্ষ্যের পর্য্যায়টি সকলের উপরে। কেননা সাক্ষ্যের দ্বারা অন্যের উপর একটি জিনিষ বাধ্যতামূলকরূপে চাপাইয়া দেওয়া হয়। সেই জন্যই সাক্ষ্য পর্য্যায়ের মধ্যে শুধু সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হওয়াই যথেষ্ট নহে, বরং তৎসঙ্গে সংখ্যারও আবশ্যক হইবে। অন্ততঃপক্ষে বিশ্বস্ত দুই জন পুরুষ বা এক জন পুরুষ ও দুই জন স্ত্রীলোক সাক্ষ্যদানকারী হইতে হইবে। ইহার কম হইলে সাক্ষ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। সাক্ষ্যের জন্য আরও একটি বিষয় অত্যাবশ্যক যে, সাক্ষীকে সাক্ষ্য গ্রহণকারী সাক্ষাতে উপস্থিত হইতে হইবে, অসাক্ষাতে লিখিত পত্ররূপে বা টেলিগ্রাম, টেলিফোন, টেলিভিশন, ইত্যাদি পন্থায় প্রদত্ত সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না*। দ্বিতীয় পর্য্যায় হইল শিক্ষা; শিক্ষাদানকারী সত্যিকারের জ্ঞানী ও প্রকৃত জ্ঞানদানেচ্ছু খাঁটী ও বিশ্বস্ত হইতে হইবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, সে তাঁহার দান করা বিষয় সমূহকে পূর্ণ মর্য্যাদা সহকারে গ্রহণ করে কিনা, মনোযোগের সহিত শ্রবণ ও গ্রহণ করতঃ উহার অর্থ, মর্ম ও বিশদ ব্যাখ্যা সম্যকরূপে অনুধাবন করতঃ (মুখস্থ করার বিষয়াবলী) যত্নের সহিত মুখস্থ করিয়া রাখে কি না। তৃতীয় পর্য্যায় হইল সংবাদ; ইহার জন্য আবশ্যক হইল সংবাদদাতা পূর্ণ বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী হওয়া। শিক্ষা ও সংবাদ পর্য্যায়দ্বয়ের জন্য সংখ্যারও আবশ্যক হয় না, সাক্ষাতেরও প্রয়োজন হয় না।

ইমাম বোখারী (রঃ) এখানে প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বিশ্বস্ত সূত্রে লিখিত আকারে যদি কোন জ্ঞান দান করা হয়, তবে শরীয়ত অনুযায়ী উহা গ্রহণযোগ্য ✣। কারণ,

---

* সাক্ষ্যের জন্য এই দুইটি বিশেষ শর্ত মোটামুটিরূপে লেখা হইল। এ বিষয়ে আরও বহু বিস্তারিত তথ্য আছে যাহার পূর্ণ বিবরণ ফেকার কিতাব সমূহে পাওয়া যাইবে।

✣ লিখিত আকারে এলম সাক্ষাতে দান করা বা প্রেরণ করা (যদি প্রেরকের লেখা চিনিতে পারে) বা লোক মারফৎ এলম প্রেরণ করা, এ সবই যদি খাঁটী বিশ্বস্তসূত্রে হয় তবে উহা গ্রহণযোগ্য হইবে, কিন্তু যেহেতু হাদীছ শাস্ত্রে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয় সেজন্য উল্লিখিত কোনও সূত্রে প্রাপ্ত হাদীছকে আখবারানা "اخبرنا" হাদ্দাছানা "حدثنا" শব্দদ্বয় দ্বারা ব্যক্ত করা যাইবে না। কারণ এই শব্দ দুইটি একমাত্র সাক্ষাতে নিজ কানে শ্রবণ করা অর্থাৎ শিক্ষাদাতা ওস্তাদ স্বয়ং পড়িয়াছেন, শিক্ষার্থী শাগের্দ মনযোগের সহিত ওস্তাদের শব্দগুলি শ্রবণ করিয়াছেন বা ওস্তাদের সম্মুখে শাগের্দ পড়িয়াছে, ওস্তাদ পূর্ণ একাগ্রতার সহিত শুনিয়াছেন এবং স্বীয় কণ্ঠস্থ বা লিপির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার ব্যাপারে শাগের্দের ভুল ত্রুটির প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখিয়াছেন। কেবলমাত্র এই সূত্রদ্বয়ে প্রাপ্ত হাদীছকেই "ছান্দাহানা বা আখবারানা" বলিয়া ব্যক্ত করা হয়।

ইহা শিক্ষা পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ধর্মীয় বিষয়সমূহে বিশ্বস্ত হওয়ার প্রথম শর্তই হইল, জ্ঞানদাতা আল্লার আইন মান্যকারী অর্থাৎ মোসলমান হওয়া; তারপর পরিচিত ও সত্যবাদী হওয়া।

(১) রসুলুল্লাহ (দঃ) কোথাও সৈন্যদল প্রেরণ করিলে (গোপণীয়তা রক্ষার্থে গন্তব্য স্থানের নাম প্রকাশ্যরূপে উল্লেখ করিতেন না, বরং সেনাপতির হাতে একটি লিপি দিয়া কোনও নির্দিষ্ট স্থানের নাম বলিয়া দিতেন যে, ঐ স্থানে পৌছিয়া লিপি পাঠ করিবে, উক্ত লিপিতে সঠিকরূপে গন্তব্য স্থানের উল্লেখ থাকিত এবং তদনুযায়ী সৈন্য পরিচালিত হইত এবং সকলেই উহা মানিয়া চলিত। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে—বিশ্বস্তরূপে প্রাপ্ত লিখিত বিষয় গ্রহণযোগ্য।

(২) আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) তাঁহার খেলাফৎ আমলে ওমর ফারুক (রাঃ) এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীগণকে লইয়া তাঁহাদের সর্বসম্মত পরামর্শে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক অক্ষরে অক্ষরে লিপিবদ্ধরূপে সুরক্ষিত ভিন্ন ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন আকারের লিখিত পবিত্র কোরআনের ছুরা ও আয়াত সমূহকে বিশেষ সতর্কতার সহিত একত্রিত করিয়া গ্রন্থাকারে এক জেলদ কোরআন শরীফ লেখাইয়াছিলেন। উহা স্বয়ং খলীফার তত্ত্বাবধানে সরকারী হেফাজতে রাজধানী মদীনা শরীফে রক্ষিত ছিল। খলীফা ওসমান (রাঃ) তাঁহার খেলাফত-কালে ঐ কোরআন শরীফের জেলদখানাকে সম্মুখে রাখিয়া তদুপরি পুনরায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতঃ সাত জেলদ কোরআন শরীফ লেখাইয়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরদের নিকট এক এক জেলদ পাঠাইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে—আমার প্রেরিত কোরআন শরীফ জেলদের কোনরূপ ব্যতিক্রমে কাহারও নিকট কোরআনরূপে কিছু লেখা থাকিলে তাহা অগ্নিদাহ পূর্বক নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে।

ইমাম বোখারী (রঃ) দেখাইতে চাহেন যে—খলীফা ওসমান (রাঃ) কর্তৃক লিখিতরূপে প্রেরিত কোরআন শরীফ সমস্ত ছাহাবা ও তাবেয়ীগণই বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইয়াছিলেন, এমনকি তিনি "জামেউল কোরআন" রূপে আখ্যায়িত হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বস্তসূত্রে লিখিতরূপে প্রাপ্ত বিষয়-বস্তু গ্রহণযোগ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—সাধারণতঃ খলীফা ওসমান (রাঃ)কে "জামেউল-কোরআন" অর্থাৎ কোরআন সঙ্কলক বলা হয়। এতদ্ভিন্ন খলীফা ওসমান (রাঃ) আদেশ জারী করিয়াছিলেন, যে, তাঁহার প্রেরিত কোরআন শরীফের ব্যতিক্রমে কোরআনরূপে কিছু লেখা থাকিলে তাহা যেন নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হয়। এই দুইটি কথাকে মূলধন করিয়া ইসলামের শত্রু কুচক্রিরা নানা অবান্তর বিষ ছড়াইয়া থাকে এবং নানা প্রকার কল্পনার অবতারণা করিয়া প্রতারণার সূত্র যোগায়।

কোরআন সঙ্কলনের প্রকৃত ইতিহাস এই যে—কোরআনের প্রতিটি শব্দ ও আয়াত নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাবতীয় উপায়ে উহাকে সুরক্ষিত করিয়া রাখা হইত। আয়াত নাযেল হওয়ার সাথে সাথে উহা রসুলুল্লার (দঃ) কণ্ঠস্থ ও হৃদয়স্থ হওয়ার ভার স্বয়ং আল্লাহ

তায়ালাই গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেমন ৪ নং হাদীছে ইহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। তারপর ছাহাবীগণ কর্তৃক মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করা হইত। তদুপরি রসুলুল্লাহ (দঃ) চারজন সুদক্ষ লেখক নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং আয়াত নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের কাহাকেও ডাকিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে উহা লেখাইয়া রাখিতেন* এবং অন্যান্য ছাহাবীগণও যথাসম্ভব লিখিয়া লইতেন। এইরূপে দীর্ঘ ২৩ বৎসরকাল কোরআনের আয়াতসমূহ ধীরে ধীরে নাযেল হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা মুখস্থরূপে ও লিখিত আকারে সুরক্ষিত হইয়া রসুলুল্লার (দঃ) বর্তমান থাকা কালেই হাজার হাজার ছাহাবীদের মুখে মুখে তেলাওয়াত হইতে থাকে। তদুপরি প্রতি বৎসর যতটুকু নাযেল হইত বৎসর শেষে রমজান মাসে ফেরেশতা জিব্রাইলের সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ সম্পূর্ণ অংশটুকু দওর করিতেন—একে অন্যকে শুনাইতেন, এমনকি ২৩শ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণ কোরআন শরীফ ঐরূপে দুইবার দওর করেন, যেমন ৫নং হাদীছে এই বিষয়টি বিস্তারিতরূপে উল্লেখ হইয়াছে। এইরূপে হযরত রসুলুল্লার (দঃ) বর্তমানেই যাবতীয় উপায় অবলম্বনের সহিত লিপিবদ্ধরূপে পূর্ণ কোরআন শরীফ সুরক্ষিত হইয়াছিল।

কিন্তু লিখিত আয়াত ও ছুরা সমুহ ধারাবাহিক ভাবে একত্রিত বা গ্রন্থাকারে সুবিন্যস্তরূপে ছিল না, বরং বিচ্ছিন্নরূপে বিভিন্ন বস্তুর উপর লিখিত ছিল। কারণ, প্রথমতঃ সে কালের সাধারণ রীতিই হয়ত এই ছিল। তা ছাড়া হযরত রসুলুল্লার (দঃ) বর্তমানে অহীর দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কোন কোন আয়াতের তেলাওয়াত মনছুখ বা রহিত করিয়া দিতেন তখন উহা বাদ দিতে হইত। আরও একটি বিশেষ কারণ এই ছিল যে—কয়েকটি বিভিন্ন ছুরার আয়াত সমুহ এককালীন নাযেল হইতে থাকিত। যেমন এখন এক ছুরার একটি আয়াত নাযেল হইল আর একবার অন্য ছুরার অন্য একটি আয়াত নাযেল হইল, আর একবার অন্য ছুরার অন্য একটি আয়াত নাযেল হইল, আর একবার অন্য ছুরার, আর একবার ঐ প্রথম ছুরার আর একটি আয়াত নাজেল হইল। এইরূপে বিভিন্ন ছুরার আয়াত এককালীন নাযেল হইত। তখন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) লেখকদিগকে নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন যে—এই আয়াতটি অমুক ছুরার অমুক স্থানে লিখিয়া রাখ। তদুপরি সময়, স্থান, শানে নুযুল ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পরের আয়াত আগে, আগের আয়াত পরে নাযেল হইত; কোরআন নাযেল হওয়ার সময় প্রকৃত ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইত না। এমতাবস্থায় কোরআন নাযেল হওয়াকালে উহাকে সুসজ্জিত সুবিন্যস্ত গ্রন্থাকারে তৈরী করা সম্ভবই ছিল না।

এতদ্ভিন্ন আরও একটি বিষয় ছিল, তাহা এই যে—বাংলা দেশেও যেমন সচরাচর দেখা যায়—পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ বিভিন্ন অংশে এবং বিভিন্ন জেলায় ও অঞ্চলে এক বাংলা ভাষার মধ্যেই উচ্চারণ, শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে বিভিন্নতা ও ব্যবধান থাকে।